বিবেকানন্দ

ও

আজকের সমাজ

মিত্র কৌটিল্য

কবন
৩৫/বি, টালিগঞ্জ রোড
কলকাতা-৭০০০২৬

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

প্রকাশক :
অমিত দাশ
৪৫/বি, টালিগঞ্জ রোড
কলকাতা-৭০০০.৬

পরিবেশক :
সেলস এ্যালায়েন্স
৭ বি, লেক প্লেস
কলকাতা—৭০০০২৯

মুদ্রক :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
জয়ন্ত ঘোষ

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে মিত্র কৌটিল্যের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে তাঁর লেখা বিবেকানন্দ চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এই গ্রন্থে মিত্র কৌটিল্য বিবেকানন্দ চর্চার প্রাসঙ্গিকতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর আলোচনার এক বিশেষত্ব বলে আজকের মানুষ সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। গ্রন্থখানি সকলের ভাল লাগলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে তা বলাই বাহুল্য।

অমিত দাশ

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজবিজ্ঞানী রূপটি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে। অনেক লেখাও বের হচ্ছে নানান পত্র-পত্রিকায়। বিভিন্ন গবেষক ও লেখক এ বিষয়ে আলোচনা করলেও একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—কোনও মডেল্ (model) আশ্রয় না করে এ-ধরণের আলোচনা কি বিজ্ঞানসম্মত ? মার্কস্, স্রস্, থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আন্দ্রে বেঁতে প্রমুখ সমাজ-বিজ্ঞানীরা নিজস্ব মডেল্ খাড়া করে আলোচনা করেছেন। ফলে তাঁদের যুক্তি-পরম্পরা বুঝতে পাঠকদের সুবিধা হয়। সমাজবিজ্ঞানী বিবেকানন্দের আলোচনায় এ-রকম কোন মডেল্ আছে কি? স্বামীজী নিজে কোন মডেল্ সরাসরি লিপিবদ্ধ করেননি, তবে তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে একটি বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজের বিশ্লেষণে এই মডেল্ প্রয়োগ করলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর সম্ভাব্য উত্তরও খুঁজে পাওয়া যায়।

স্বামীজীর লেখার মধ্য থেকে এই মডেল্ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

বর্তমান সমাজের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আধুনিক বিশ্বমানসের চেহারাটা ধরা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এবং বিংশ শতাব্দীর মানুষের মধ্যে কি কোনও মূলসূত্র আছে যা তার মৌল মানসিকতাকে প্রকাশ করে। এই মৌল মানসিকতাকে আবিষ্কার করে দেখানো হয়েছে সভ্যতার পরিবর্তনের ফলে বর্তমান পৃথিবীতে কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রয়াস, তার বিদ্রোহ-বিপ্লব, ব্যক্তিত্বের বিকাশে কোন্ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে সেগুলি আলোচনা করে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা দেখানো হয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় সমাজের যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলি—বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতীয় সংহতির দুর্বলতা, নারী-অবমাননা, পণপ্রথা, নব্যধনী মানসিকতার প্রকোপ, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু-প্রতিক্রিয়া, বৈষম্য ইত্যাদি—এগুলির পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর উক্তির পর্যালোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে পাঞ্জাব-সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, গোর্খাল্যাণ্ড-ঝাড়খণ্ড বিতর্ক,

আসাম-সমস্যা, তপশীল সম্প্রদায়ের জন্য আসন-সংরক্ষণের বিরুদ্ধে গুজরাট-মহারাষ্ট্র-অন্ধ্রপ্রদেশে বিক্ষোভ, নথুহত্যার ব্যাপকতা ইত্যাদির মূল কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা আছে এখানে। জাতিগত-ধর্মীয়-ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মানসিকতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে চেষ্টা করেছি বিবেকানন্দ-মননালোকে।

স্বামীজীর চিন্তাকে এরপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক পর্যায়ে। মার্কস ও স্বামীজী উভয়েই রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন যদিও এ-প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। বর্তমান ভারতের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী-বিশ্লেষণের প্রয়োগ কোনও বিবেকানন্দ-গবেষক করেছেন কিনা তা চোখে পড়েনি। মার্কস যেখানে স্টেট-ইডিওলজীর ওপর জোর দিয়েছেন, সেখানে স্বামীজী স্টেট-ইডিওলজীর সঙ্গে সমাজমানসকেও যুক্ত করেছেন। বিবেকানন্দ মডেল্ প্রয়োগে বর্তমান ভারতের কেন্দ্রীয় শাসক-সম্প্রদায় (তৃতীয় অধ্যায়ে) ও পশ্চিমবঙ্গের শাসক সম্প্রদায়ের (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) শ্রেণী-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে জনসাধারণের বা সমাজমানসের বর্তমান অবস্থা। বিবেকানন্দকে যারা সমাজবিপ্লবী হিসাবে প্রকাশ করতে চান, তাদের পক্ষে এ-ধরণের বিশ্লেষণ দরকার কারণ এর মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে বিপ্লবের পথনির্দেশ।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিবেকানন্দ-মননালোকে আলোচনা করা হয়েছে মানুষ কেন যুগে-যুগে বিপ্লব করতে চায়। জনসাধারণই রাষ্ট্র গড়ে তোলে, আবার জনসাধারণই রাষ্ট্রের পরিবর্তন চায় কেন? বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে এগুলির বৈশিষ্ট্য কি, ভিত্তি কি, রাষ্ট্র কিভাবে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জনগণ কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের পথ বেছে নেয়।

মার্কস যেখানে অর্থনৈতিক বা বিষয়গত সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন, স্বামীজী সেখানে বিষয়ীগত সম্পর্ককেও সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন। ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের বিভিন্ন দিক—যার প্রতিফলন ঘটছে পারিবারিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে—তুলে ধরে পথ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

অনেকেরই সাহায্য পেয়েছি বইটি লেখার সময়। প্রথমেই মনে পড়ছে বিপ্লবী সুনীল দাস ও বিজয় নাগের কথা যারা ক্রমাগত তাড়া দিয়ে এটি লিখিয়ে নিয়েছেন। অমিত দাশ উদ্যোগ নিয়েছেন বই প্রকাশে। অজস্র

কাজের মধ্যে থেকেও ডঃ সজল বসু বন্ধুকৃত্য করেছেন এটিকে সম্পাদনা করে দিয়ে। মনে পড়ছে ডঃ কেদারনাথ দাশ, সুমিতা সাক্সেনা, ডঃ জামিল হাসান, সবিতু রায়চৌধুরী, রামেশ্বর যাদব, কেকা মিত্র, ইলা ভার্মা, ডঃ পুনিতা মেহেতা, আরতি শ্রীবাস্তব প্রমুখের কথা যাঁরা সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যায় বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলে ও আলোচনা করে লেখককে উদ্দীপিত করেছেন। মনে পড়ছে মাতৃপ্রতিম নন্দিতা লাহিড়ীকে যিনি অগাধ স্নেহে বারবারই জিজ্ঞেস করেন—পরবর্তী বই কবে বেরুচ্ছে? এঁদের সবার কাছেই আমি ঋণী। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রচ্ছদশিল্পী জয়ন্ত ঘোষকে এবং প্রভাবতী প্রেসের কর্মীবৃন্দকে।

—মিত্র কৌটিল্য

॥ সূচীপত্র ॥

এক ঃ বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা

মানুষের বিভিন্ন প্রয়াসের পেছনে আছে পূর্ণতাপ্রাপ্তির তাগিদ। এই পূর্ণতার আকুতিকে মানুষ যুগ-যুগ ধরে অনুভব করলেও সে এটিকে পুরোপুরি ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি। বিজ্ঞানের শুরু alchemy থেকে। প্রাচীন মানুষ খুঁজে ফিরেছিল পরশপাথরের, যার ছোঁয়ায় সব সোনা হয়ে যাবে। তার কাছে সোনা শুধু একটি ধাতুই ছিল না, ছিল পূর্ণতার একটি প্রতীক—যে সোনা দেবে মুক্তির স্বাদ, অমরত্বের ছোঁয়া। মিশরের পিরামিডগুলিও সেই পূর্ণতার প্রতীক, যা টিঁকে থাকবে যুগ-যুগ ধরে প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করে। আদিম ধর্মের শুরুও এভাবে। আদিম মানুষ কল্পনা করেছে স্বর্গের, যে স্বর্গ তার কাছে মুক্তির আশ্বাসস্থল। রাষ্ট্রনীতির অঙ্কুরও প্রকাশিত হয়েছিল এভাবে। বন্য পশু, অন্য গোষ্ঠীর মানুষ এবং নিজের গোষ্ঠীতে বিবাদ আদিম মানুষকে বারবার কষ্ট দিয়েছে। অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে বুঝেছে, নিজের দলে সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি চালু করে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরোধীর মোকাবিলা না করলে পৃথিবীতে সুখে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এভাবেই আইনবদ্ধ গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল যার ক্রম-পরিণতি রাষ্ট্রনীতি। শিল্পের জন্মও এভাবে। আদিম শিল্পীর কাছে আনন্দই ছিল পূর্ণতার প্রতীক। সেই পূর্ণতাকে সে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে গুহার দেয়ালে।

এই মৌল চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে মানুষ শুধু তার পরিবেশ ও পৃথিবীটাকেই পালটায়নি, সেই সাথে বদলিয়েছে নিজেকেও। এভাবেই তার চেতনার বিকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যুগ-যুগ ধরে মানুষ চেষ্টা করেছে পূর্ণতাপ্রাপ্তির; মুক্তির কামনাই মানুষের সব বাসনা ও কর্মের মূল। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"Freedom, Freedom is the song of the soul"—মুক্তিই মানবাত্মার চিরন্তন সঙ্গীত। মানুষ মুক্তি চাইছে এই বহির্জগতের (external nature) বিভিন্ন শক্তির বন্ধন থেকে, অন্তর্জগতের (internal nature, mind) দ্বন্দ্বময় অবস্থা থেকে, এবং সে মনে করছে এই মুক্তির পথেই সে পূর্ণতা পাবে। এই যে পূর্ণতাপ্রাপ্তি বা মুক্তি, এটির সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা—আদিম মানুষ আর আধুনিক মানুষের ধারণাও এ-বিষয়ে এক নয়। তবুও মূল উৎস হিসেবে এই পূর্ণতা বা

যুক্তির আকুতি সব চিন্তা ও কর্মের নিয়ামক। এই সাথেই মানুষ সবকিছুর মধ্যে খুঁজতে চেয়েছে কার্য-কারণ সূত্র। এটিই মানুষকে বিচারশীল করে তুলেছে, যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে।

এই পথে এগোতে গিয়ে মানুষ দুটি স্তরে তার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছে—জৈবিক অস্তিত্বে (existence in biological sphere) এবং মানসিক স্তরে পূর্ণতার মাধ্যমে (significance in psychological level)। পরিবেশে যখন পরিবর্তন ঘটে তখন পশু-পাখি নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন এনে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়েছে, কিন্তু মানুষ তা না করে পরিবেশের রূপান্তর ঘটিয়েছে নিজের প্রয়োজনে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজনীতি ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ এ-কাজ এখনও করছে। এই জৈবিক অস্তিত্বের সাথে সাথে মানুষ তার মনোজগতে অনুভব করেছে বেঁচে থাকার তাৎপর্য। এভাবেই গড়ে উঠেছে সংস্কৃতি-শিল্পকলা ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ এখানেই থামেনি। এই তাৎপর্যের সন্ধান করেছে শুধু সমাজবদ্ধ জীব হিসেবেই নয়, ব্যক্তিজীবনেও এর সন্ধান সে করেছে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও যে পূর্ণতা সে খুঁজেছে, তারই মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই যে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতা, এ-সম্বন্ধেও এক-এক জনের ধারণা এক-এক রকম। ক্ষুদিরাম একরকম ভাবে খুঁজেছেন, গান্ধী আরেক রকম ভাবে ; সাহিত্যিক-শিল্পী একভাবে, ব্যবসায়ী অন্যভাবে ; সন্ন্যাসী এক পথে, বৈজ্ঞানিক আরেক পথে। মানুষ তো শুধু জৈবিক অস্তিত্বেই তৃপ্ত নয়, সে তার জীবনের একটা তাৎপর্য খুঁজে পেতে চায়।

আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ মানুষের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। দিল্লী-মস্কো-ওয়াশিংটনের দূরত্ব কমেছে, কিন্তু বেড়েছে মানুষে-মানুষে দূরত্ব। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ চাঁদে নামছে, ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছে, যন্ত্রদানব বিনীত ভৃত্যের মতো মানুষের সেবায় তৎপর, ক্যান্সার রোগকে জয় করতে চলছে মানুষ, কিন্তু সেই সাথেই বাড়ছে মানসিক দূরত্ব। বিজ্ঞানের দিগন্তপ্রসারী জয়ে আজ তাই ক্ষুব্ধ মানুষের প্রশ্ন—এ কার জয় ? কিসের জয় ? মানুষ যদি পারস্পরিক সৌহার্দ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে না পারে তবে বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কার কাদের জন্য ?

সমস্যাটা তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে

এক বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "তোমরা যাকে উন্নতি বলো তা তো কামনা-বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধি।" শিল্পযুগের আলোর ঝলকানিতে মানুষ মোহান্ধ হয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ্যার যেমন ভাল দিক আছে, তেমনি আছে মন্দ দিক। প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষ তার দৈহিক অস্তিত্বকে গড়ে তুলছিল নবরূপে। হাত ধরে এল রাষ্ট্রনীতির নতুন নতুন মতবাদ। সংস্থার রূপ পরিবর্তনের (institutional change) সাহায্যে নবলব্ধ সেই শক্তিকে মানুষ পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিল—এল পুঁজিবাদ, এল সমাজতন্ত্র। দুই মতবাদই জোর দিল অধিক উৎপাদনের ওপর। হেনরী ফোর্ড যে দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে তার গাড়ির কারখানা সম্প্রসারণ করলেন, স্তালিনও সেই দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই শিল্পসম্প্রসারণ করলেন। রাশিয়ার নেতারা দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন: উৎপাদনে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাও। আর এই উৎপাদন শুধু খাদ্য-বস্ত্রের নয়, যুদ্ধাস্ত্রেরও। খাদ্য-বস্ত্রের উৎপাদন বেশি হওয়া প্রয়োজন মানুষের স্বার্থেই। কিন্তু এই উৎপাদনে লাভবান হল ধনীরা, এবং সেই সাথে মধ্যবিত্তরাও। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশই স্ফীত হচ্ছে।

মানুষের দৈহিক ক্রিয়াকর্মের ভার যতই মেশিনের হাতে যাচ্ছে, ততই সে অবহেলিত সমস্যাটির মুখোমুখি বেশি করে হচ্ছে। আর এই সমস্যাটি হল তার মানসিক অস্তিত্বের সমস্যা। যুগ-যুগ ধরে দৈহিক অস্তিত্বের রক্ষার সংগ্রাম চলছে, প্রযুক্তির অসাধারণ প্রগতিতে সেই সমস্যার সমাধান এখন মানুষের হাতের কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে। এর শেষ সমাধান আর ততটা যন্ত্রের ওপর নির্ভর করছে না, যে নতুন উপাদানের (factor) ওপর এটি নির্ভরশীল, সেটি হল মানুষের মন। ভারতে আজ খাদ্যের অভাব নেই, আরবীয় রাষ্ট্রগুলিতে অর্থের অভাব নেই, রাশিয়ায় ব্যক্তিগত পুঁজি অনেকটা বিদায় নিয়েছে, আমেরিকায় প্রাচুর্যের কমতি নেই। তবুও এ-সব দেশে সব সমস্যার সমাধান করা যায়নি একটি বস্তুর অভাবে—মানুষের মনে শান্তি ও স্বস্তি।

আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য গতি। একদিকে যেমন যান-বাহনের গতি বাড়ছে, পরিবর্তনের গতি বাড়ছে, পরিবেশ বদল হচ্ছে দ্রুত-গতিতে, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানও বাড়ছে দ্রুত। ক্ল্যাসিক্যাল ফিজিক্স থেকে কোয়ান্টাম্ মেকানিক্স্ আসতে যত সময় লেগেছে, সাইকোলজি থেকে প্যারা-সাইকোলজি এসেছে তার চেয়েও কম সময়ে। প্রপেলার থেকে জেট্ প্লেন হতে যে সময় লেগেছে, তার চেয়ে কম সময়ে মানুষ লাভ করেছে চন্দ্রগতি

থেকে সৌরগতি। সেই সাথে পালটাচ্ছে পরিবেশ। গত দশ বছরে প্রচার মাধ্যম ও প্রযুক্তির প্রভাবে মানুষের জীবনাচার, মানসিকতা কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সেই সাথেই বদলেছে নবীন প্রজন্ম ও তার মন। মা-বাবা যেভাবে চিন্তা করেন, সন্তানের চিন্তাধারা তা থেকে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির, ছাত্র ও শিক্ষকের চিন্তাধারার মধ্যে ব্যবধান বাড়ছেই।

এই যে গতি—আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—এটির প্রয়োজন মানুষের স্বার্থেই, কিন্তু এই গতিই আবার বাড়িয়ে তুলেছে মানুষের অস্থিরতা। "সাময়িকতা"-ই প্রধান হয়ে উঠেছে মানুষের চিন্তায়, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে।

যে গতি বহির্জগতে মানুষ লাভ করেছে, অন্তর্জগতে ততটা গতিশীল হয়ে ওঠেনি তা। নিজস্ব মতবাদ, চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি তার মনকে ভারী করে তুলেছে, নিরাপত্তার তাগিদ ও স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা তার মনকে অস্থির করে তুলেছে। স্থিতিশীলতার চাহিদায় সে ব্যক্তিজীবনে বিদ্রোহী সত্তাকে হারাচ্ছে, সামাজিক দুর্নীতির সাথে আপস করছে, ব্লু-কলার শ্রমিক হোয়াইট-কলার শ্রমিকে পরিণত হওয়াকেই সিদ্ধিলাভ বলে ভাবছে। প্রজন্মের ব্যবধানে মা-বাবা আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন এই স্থিতিশীলতার তাগিদেই, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন গোষ্ঠী-চেতনার আবির্ভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠছেন নেতারা, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নতুন নতুন দাবিতে হতবাক সমাজ-পরিচালকেরা। বহির্জগৎ যতটা গতিশীল, অন্তর্জগৎ ততটা গতিশীল না হলে এই দুইয়ের মধ্যে বাধে সংঘাত। বহির্জগৎ মানুষকে ক্রমশই সামনে টানছে, অথচ অন্তর্জগৎ স্থিতিশীল থাকতে চাইছে কিংবা কম গতিশীল।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে চেতনা এনে দিচ্ছে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর-ভাবে। প্রাকৃতিক শক্তির বাধা থেকে মানুষ মুক্তি তো পাচ্ছেই, সেইসাথে তার কর্মশক্তিও বাড়ছে যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু এই সাথেই মানুষ যদি স্বাধীন সত্তার দিকে নজর না দেয়—আবেগ, সহজাত সংস্কার, কামনা-বাসনা ইত্যাদিকে জয় করার চেষ্টা না করে, তবে সে এই ব্যবহারিক জগতের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করবে স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থে। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞান বস্তুগতভাবে নীতি-নিরপেক্ষ। আসলে বিজ্ঞান মানুষের সামনে কয়েকটি বিকল্প সম্ভাবনা তুলে ধরে, যে পারমাণবিক জ্ঞান মেগাটন

বোমা তৈরি করে সেই জ্ঞানই আবার একে ব্যবহার করতে পারে রোগমুক্তি, শক্তি উৎপাদনে। মানুষ কোন্ বিকল্প পথ নেবে সেই অনুযায়ীই প্রযুক্তি গড়ে উঠবে। বিজ্ঞানী এক্ষেত্রে কিছুটা অসহায়, কারণ বোমা তৈরি হবে, না সৌরশক্তি উৎপন্ন করে উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে, এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করে বিজ্ঞানীদের ওপর নয়, রাষ্ট্রনেতাদের ওপর। আলফ্রেড নোবেল তাই ডিনামাইট আবিষ্কার করেও প্রায়শ্চিত্ত করেন সঞ্চিত অর্থ মানুষের সেবায় উৎসর্গ করে, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ শুনে আইনস্টাইন তাই নীরবে চোখের জল ফেলেন, শাখারভ তাই ধিক্কারে সরব হয়ে ওঠেন। আজ বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের আঙুল এমন একটি বোতামের ওপর যে বোতাম টিপে দিলে এই পৃথিবী জনশূন্য হতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগবে না। এভাবে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে যে অতিবিস্তৃত objective freedom পেয়েছে, স্বাধীনতার সেই পরিবেশ মানুষ দূষিত করে তুলছে Subjective freedom-এর অভাবে।

পথের সন্ধানে

পথ কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ দুয়ের ওপরই আধিপত্য বিস্তার করতে ("The aim is to manifest this Divinity within by controlling nature, external and internal.")। বিজ্ঞানের গতিরোধ করে Objective freedom-কে সীমিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আরও উন্নতি দরকার। কিন্তু সেই সাথেই দরকার স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা—objective ক্ষেত্রের সঙ্গে Subjective ক্ষেত্রেও একে নিয়ে যাওয়া। এই Subjective freedom-এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বামীজী বারবার বলেছেন জোর দিয়ে। তাঁর "মানুষ গড়া"র ডাক এই উদ্দেশ্যেই। আত্মিক বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করে না তুললে যে-কোন বিপ্লবই যে পরিণামে বিপর্যয় নিয়ে আসে—সে-কথা সতর্কবাণী হয়ে ছড়িয়ে আছে স্বামীজীর বাণী ও রচনায়।

এই Subjective freedom-এর অভাবেই মানুষের চিন্তার দৈন্য, জীবনে পরিবর্তন আনতে অনীহা, মতান্ধতা, এবং পরিণামে মানুষে-মানুষে সংঘাত। একদিকে পুঁজিবাদী সমাজ, অন্যদিকে একনায়কতন্ত্রী সমাজ, এই দুই শিবির বিশ্বের ভবিষ্যৎ ক্রমশই দুর্বিসহ করে তুলেছে। মুখে এরা গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের

কথা বললেও কাজে স্বৈরতন্ত্রী। অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যবিত্ত সমাজ ভুগছে চিন্তার দৈন্যে—হয় মার্কিন পুঁজিবাদ, নয় মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্র, এই দুইয়ের বাইরে এরা কিছুই চিন্তা করতে পারেনা। যেসব বুদ্ধিজীবী আমেরিকা-রাশিয়ার সেবাদাস, তাদের মনোভাবের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা নতুন পথ উদ্ভাবনে স্বকীয়তা দেখাতে ব্যর্থ কেন? আজ সময় এসেছে নতুন করে চিন্তা করার, যার সূত্রে ব্যবহারিক কর্মসূচীর মাধ্যমে আসবে মানুষের সামগ্রিক মুক্তি, যে-মুক্তি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে।

এই সামঞ্জস্য আনতে না পারার ফলে ব্যক্তিমানুষ খুঁজছে নানারকম এড়িয়ে-যাবার পথ (escape)। বহির্জগতে গতির চাপ ও অন্তর্জগতে স্থিতির চাপ দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে আসছে পরস্পর বিরোধিতা।

জীবনের তাৎপর্য মানুষ যে খুঁজছে না, তা নয়। বিভিন্ন পথে এটিও সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিভাবে? এবং তার পরিণামই বা কি?

কেউ কেউ খুঁজছেন কোন-না-কোন দর্শনের মধ্যে! দর্শন তার উত্তুঙ্গ চিন্তা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকে মূলতঃ অনুমান-ভিত্তিক সিদ্ধান্তের ওপর। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষের ওপর কোনও দর্শন ভরসা করে না, করলে বিজ্ঞান তাকে আত্মসাৎ করে ফেলবে। প্রত্যক্ষকে স্বীকার করে নিয়েও দার্শনিক তাই তার অন্তরের শিখাকে প্রজ্জলিত রাখেন। এর ফলে দু-ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, সাদা আলো যেহেতু সাতটি রঙের সমাহার, তাই কেউ সেই দার্শনিকের শিখায় লাল রংটিই দেখেন, কেউবা নীল, কেউবা হলুদ, কেউবা সবুজ। দ্বিতীয়ত, সাধারণ দার্শনিক চিন্তাগুলি নির্দেশ দেয় অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার। এবং এর ফলে দেখা দেয় সমস্যা, কেন-না দার্শনিক সিদ্ধান্তকে মানুষ চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর স্থাণুত্ব আরোপ করে। কিন্তু জীবন সবসময় গতিশীল। স্থাণুতত্ত্ব দিয়ে গতিময় জীবনকে ব্যাখ্যা করা তাই অনেক সময়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক দর্শনচিন্তাও (social philosophy) এ থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া এই চিন্তার মূল উদ্দেশ্য সংস্থানিক পরিবর্তন (institutional change)। আমরা আগেই দেখেছি, আত্মিক বিপ্লব না ঘটলে সংস্থানিক পরিবর্তন মৌল সমাধান আনতে পারে না। সমাজ-দর্শনকে আশ্রয় করে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে অনেক বিপ্লব করেছে কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর নামে। কিন্তু

তার পরিণতি কি? সকল বিপ্লবের পর ব্যক্তি-মানুষকেও দাসত্ব করতে হয়েছে বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর কাছে। দলরূপী বিশাল যন্ত্রের সামান্য নাট-বল্টু হিসেবে গণ্য হয়েছে মানুষ, ব্যক্তি-মানুষ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা সত্তাকে খুঁজে পায়নি। মুষ্টিমেয় নেতার হাতেই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে থেকেছে, পরে এরাই আবার পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন আরও ক্ষমতা-লাভের জন্য। ফরাসী বিপ্লবের নায়কদেরও শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ হারাতে হয়েছিল, দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল ট্রটস্কি, লিন-পিয়াওকে। নির্বাসিত হতে হয়েছিল দেঙ্‌কে।

এই শোচনীয় পরিণতি দেখে ব্যক্তি-মানুষ অনেক সময় একাই বিদ্রোহ করেছে সমাজের বিরুদ্ধে—কখনও কালাপাহাড়ের মতো, ভিয়োজিওর মতো বিদ্রোহ করেছে, কখনও বা হিপিদের মতো নীরব অস্বীকারের মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে দূরে চলে গেছে। ব্যক্তিগত ক্ষমতায় সমাজকে প্রচণ্ড আঘাত করে নিজের ঘৃণাকে প্রকাশ করেছে মানুষ, কিন্তু ইতিহাসে তার উল্লেখ রয়েছে নেহাতই সাময়িক ঘটনা হিসেবে। তাছাড়া প্রশ্ন থেকেই যায়—সংগঠনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক। কিছু ব্যক্তি-মানুষ একা কতটা করতে পারেন?

কখনও বা এই পথে না গিয়ে ব্যক্তি মানুষ সমাজের রীতি-নীতি মেনে নিয়ে সাফল্যের শীর্ষে উঠতে চেয়েছে, চেয়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মান ও সম্পদ। কিন্তু সমাজে "সফল" মানুষেরা বড় একা। পণ্ডিত, শিল্পী, ধনী, উচ্চপদস্থ লোকেরা নিঃসঙ্গতার শিকার। সম্মান-মর্যাদা মানুষকে যতটা দেয়, কেড়ে নেয় তার অনেক বেশি। তাছাড়া এই সাফল্যই বা কতদিনের? সমাজে আরও অনেকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঐ উচ্চাসনের দিকে। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী তাই চেষ্টা করেন নবীন শিল্পীদের সুযোগ না দিতে, জরাগ্রস্ত মন্ত্রীরা তাই পথরোধ করে থাকেন দলের তরুণ সদস্যদের, জনপ্রিয় সাহিত্যিক তাই অযথা সমালোচনা করেন প্রতিশ্রুতিবান নবীন লেখককে। সামাজিক সফলতা মানুষকে শুধু নিঃসঙ্গ করে না, করে সত্য-মিথ্যা ভয়ের নিত্যসঙ্গী।

বাস্তবজীবনে এই সর্বগ্রাসী অসহায়তার মুখোমুখি হয়ে অনেকে ধর্মের আশ্রয় নেন, কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে চান না। ফলে মানুষ ধর্মের নামে আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে, পুরোহিত-তন্ত্রকেই (priestcraft) প্রকৃত ধর্ম মনে করে, কিংবা অলৌকিকত্ব প্রবণ (miracle monger) হয়ে পড়ে। প্রথম দল সাম্প্রদায়িক ধর্মের কবলে পড়ে মতান্ধতা ও বিভেদের শিকার হন, অনুভূতি

(realization) ও স্বাধীন চিন্তার বদলে কতগুলি আচার-প্রথা-বিশ্বাসকেই প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করেন, পুরুষকারের প্রকাশ না ঘটিয়ে অলৌকিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন যে দৈবে নির্ভরতা ও ঈশ্বর-প্রীতি সমার্থক নয়। স্বামী বিবেকানন্দ আচার-প্রথা-মন্দির-শাস্ত্রকে ধর্মের গৌণ অঙ্গ বলে ঘোষণা করে উপলব্ধিকেই প্রকৃত ধর্ম বলেছিলেন ("Religion is realization")। এভাবে প্রকৃত ধর্মকে বুঝতে না পেরে একদল মানুষ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্তমানকে অবহেলা করছেন। আরেক দল ধর্মীয় সাধনার প্রস্তুতির পরিবর্তে তাৎক্ষণিক ফল লাভের আশায় অলৌকিকত্ব-প্রবণ হয়ে পড়ছেন। এরা বিনা শ্রমে দামী বস্তু পেতে আগ্রহী। এভাবে ধর্মের নামে তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়-উত্তেজনাকেই (sensation) প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এরই আরেক রূপ জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্য নেওয়া। মানুষ স্বীয় পুরুষকারে আস্থাশীল নয় বলেই মাদুলী-তাবিজ-পলা-নীলা ধারণ করে। অসহায় মানুষ এভাবে আরও অসহায় হয়ে পড়ছে। আর স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্মের প্রথম সাধনাই হল ক্লীবতার পরিত্যাগ।

সুতরাং এটা পরিষ্কার, সমাজ ও ব্যক্তির উন্নতির জন্য নতুনভাবে চিন্তা করা দরকার। এবং এই চিন্তা করতে হবে স্বাধীন মানুষকে। রাজনৈতিক দলগুলি বা নেতাদের কাছে কিছু আশা করা বাতুলতা, কারণ রাজনীতি আজ ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে এবং সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা, যাদের চরিত্র ও নীতি বলে কিছু নেই, তারাই রাজনীতি-প্রাঙ্গণে ভীড় করে রয়েছেন। তাই শুধু কল-কারখানার ধোঁয়া বা গঙ্গার জল পরিষ্কার করে পরিবেশ-দূষণ দূর করা সম্ভব হবে না, অন্তত যতদিন এ-সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ামক থাকবেন।

স্ববিরোধিতা কেন?

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের জীবন ছকে বাঁধা। ভাল ইস্কুলে ভর্তি হবার চেষ্টা, বাড়িতে ও ইস্কুলে শিক্ষকদের কাছে পড়া, ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হওয়া, অফিসে কোন ইউনিয়নে যোগ দিয়ে দাবিমুখর আন্দোলনে নামা, প্রমোশন, রিটায়ারমেণ্ট—কর্মজীবনের এই গতানুগতিকতার সাথে ব্যক্তিজীবনে বিয়ে, ছেলে মানুষ করা, অবসর, বিনোদন—এটাই মোটামুটিভাবে সাধারণ মানুষের জীবন। এই সাধারণ জীবনে সাময়িক উত্তেজনা জোগায় পরচর্চা, রাজনৈতিক

আলোচনা, সিনেমা, টেলিভিশন, ফুটবল, দেহজ-প্রবৃত্তি, ড্রাগস্ ইত্যাদি। জীবন গতানুগতিক হয়ে ওঠায় সৃজনশীল চেতনার আনন্দ খুব কম লোকই পায়, অধিকাংশের জীবনে আনন্দের একমাত্র তৃপ্তি sensation-এ। এবং যদি এদের প্রশ্ন করা হয় "কেন এমন হল ?" এরা অম্লান বদনে উত্তর দেবেন—"সমাজ-ব্যবস্থা"। সমাজ-ব্যবস্থার দোহাই দেওয়া আধুনিক অদৃষ্টবাদ। "আমার কোনও দোষ নেই, আমি তো হীরের টুকরো, শুধু সমাজ-ব্যবস্থার জন্যই এই হীরের দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে না"—এই হল আধুনিক অদৃষ্টবাদের মর্মকথা। অথচ এই সমাজে আজও এমন মানুষ রয়েছেন যারা স্বকীয়তা প্রকাশ করেন, অন্যায়ের সামনে মাথা নোয়ান না, সদা পরাজয়ের মধ্যেও একক সংগ্রামের প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখতে পারেন। অধিকাংশ মানুষ তা পারেনা কেন ?

আগেই বলেছি, মানুষের মূল চাহিদা দুটি—দৈহিক অস্তিত্ব ও মানসিক পূর্ণতা। এই দৈহিক অস্তিত্বের তাগিদেই সে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, চাকরী বা ব্যবসা করে, আন্দোলন করে। কিন্তু সমস্যা হল, তার মানসিক পূর্ণতা নিয়ে। সে বেঁচে থাকার একটা তাৎপর্য খুঁজতে চায়। এই তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই। এই পথে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাহসী প্রশ্ন তুলে ধরা—শুধু সমাজ-সম্পর্কেই নয়, নিজের সম্পর্কেও। যে-কোন কারণেই হোক এই সাহসী প্রশ্ন মনে না ওঠায় মানুষ তার পূর্ণতা খুঁজতে চাইছে কেবল এই সমাজের মধ্যেই। এভাবে সমাজের কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে উঁচু পদে ওঠার জন্য তার অক্লান্ত চেষ্টা চলে। একজনই ছাত্রেরা ডাক্তারী-ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চায়, ব্লু-কলার শ্রমিক হোয়াইট-কলারে পরিণত হতে চায়, এম-এল-এ-মন্ত্রী হতে চায়। সামাজিক সাফল্যের নিরিখেই মানুষ তার মানসিক পূর্ণতা খুঁজছে। এবং এটিই নিয়ে আসছে স্ব-বিরোধিতা। সামাজিক সাফল্যই যদি অন্তরের তৃপ্তি আনে, জীবনকে তাৎপর্যময় করে তোলে, তাহলে সমাজের রীতি-নীতি মেনে নিতেই হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ এমন অবস্থায় যেতে চায় যে-অবস্থাকে সমাজ স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ শেষ বিচারে তারা সমাজের সাথে আপোষ করে। সামাজিক ধ্যান-ধারণা বা মূল্যবোধকে তারা প্রশ্ন করেনা, এগুলির বিরুদ্ধে যেতে চায়না, কারণ এই মূল্যবোধগুলির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক স্বীকৃতি। অথচ মানুষ বোঝে স্বাধীনতায় সমুজ্জল হয়েই তার জীবনে এই পূর্ণতা খুঁজে পাওয়া যায়, একক মানুষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার প্রতিফলন ঘটে-মানুষ যে এ-কথা বোঝেনা তা নয়।

সে মনে এই তাগিদ অনুভব করে, কিন্তু একে প্রকাশ করতে পারে না ঠিক-ভাবে। সে ভাবে বড় ডাক্তার, বড় ইঞ্জিনীয়ার, মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি হলেই তার স্বকীয়তা প্রকাশ পাবে, তার একক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে।

এটিই মানুষের জীবনে স্ব-বিরোধিতা। সে সমাজকে অনুসরণ করে, আবার স্বকীয়তাও চায়। এই দুই বিপরীত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সে বিমূঢ়। সে না পারছে সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে, না পারছে স্বকীয় মৌলিকতার পরিচয় দিতে।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠী

স্বামীজী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যৌল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গণতন্ত্রের ভাল দিকটি কি? তাঁর মতে, এতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, মানুষ স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করে, কাজ করে। আর এর মন্দ দিক হল এর অত্যধিক প্রয়োগে জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, শাসকেরা "দিনে ডাকাতি" শুরু করে। আর সমাজতন্ত্রের ভাল দিকটি কি? স্বামীজীর মতে, "সমাজ-নির্দেশিত কর্মে ব্যক্তির কর্মনিপুণতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ নিজের স্রোতে চলে।" এর মন্দ দিক হল সমাজের কাছে ব্যক্তির দাসত্ব—পরিণামে উৎসাহ, মননশীলতা, তীব্র অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ বুঝতে পারেনা স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় দ্যুতি কি বস্তু। তিনি দেখিয়েছেন, বৈচিত্র্যকরণের ওপর গণতন্ত্রী যে গুরুত্ব দেন তা যেমন সঙ্গত, তেমনি সমাজতন্ত্রীর যৌথস্বার্থের গুরুত্বও সঙ্গত। আর এ-কারণেই তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বার্থে "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" আদর্শ যুক্ত করতে চেয়েছেন। এ-জন্যই "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণের জন্য—তাঁর ঘোষিত বাণী।

সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনগুলি মানুষকে collective being হিসেবে দেখে। মনোবিজ্ঞানও একই পথের পথিক, আর পাঁচটি বিজ্ঞানের মতো এটিও law of averages নিয়ে চিন্তা করে। বিজ্ঞান সবকিছুর মধ্যে সাধারণ সূত্র (common law or characteristics) খোঁজে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ গড়পড়তা সূত্র দিয়ে সবকিছুকে বিচার করে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদিকে যখন থেকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল তখন থেকে এগুলির মধ্যেও একবাদী ব্যাখ্যা (monistic view) আবিষ্কারের চেষ্টা হতে লাগল। ফলে এইসব কিছুই শেষ পর্যন্ত জনতার

দর্শন—philosophy of masses—হয়ে দাঁড়াল। স্বামীজীর মৌলিক অবদান এই যে তিনি যে দর্শনের কথা বলেছেন সেটি philosophy of man and masses—একাধারে ব্যক্তি ও জনতার দর্শন।

ব্যক্তি-সমস্যারই বৃহত্তর রূপ সামাজিক সমস্যা। ব্যক্তি যেন সমাজেরই জেনেটিক্ কোড্ (genetic code)।

আজ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক অথবা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এই প্রবণতার পেছনে লুকিয়ে আছে মতান্ধতা ও নিরাপত্তার তাগিদ—এটির মূল পাওয়া যায় ব্যক্তি-মানুষের মনে। মানুষ মতান্ধ কেন হয় ? মানুষের দৈহিক জীবনযাত্রায় সে যেমন একটি ছক (pattern) গড়ে তোলে—যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়া, বাজারে-অফিসে যাওয়া, সন্ধ্যায় ক্লাবে, বাড়িতে ছেলে-মেয়েকে পড়ানো—তেমনি সে একটি মানসিক ধারাও (mental pattern) গড়ে তোলে তার নিজস্ব বিশ্বাস-অভ্যাস-রুচি ইত্যাদির সাহায্যে। এই দৈহিক ও মানসিক নিজস্ব ধাঁচের মধ্যে চলাফেরা করলে তার সুবিধা হয়, এবং এটির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখা দিলে সে অসুবিধা বোধ করে ; যেমন যিনি দুপুরে ভাত খান, তাকে যদি একদিন দুপুরে রুটি খেতে বলা হয় তবে কুড়িটা রুটি খেলেও তার মনে হবে পেট ভরেনি। দৈহিক ব্যাপারের মতো মানসিক ধারা বদলেও মানুষের কষ্ট হয়। যে মতবাদ-দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করে মানুষ তার মানসিক ধারা গড়ে তুলেছে, তার বাইরে নতুন কোন চিন্তার মুখোমুখি হলে—যদি সেই চিন্তা তার মানসিক ধারায় খাপ না খায় তবে সে অস্বস্তি বোধ করে। যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ধারাই মানুষকে বদ্ধ করে, বিচ্ছিন্ন করে, এবং পরিণামে মতান্ধ করে তোলে তার মতের বাইরেও যে সত্য থাকতে পারে এ-কথা সে বিশ্বাস করতে চায়না। এভাবে সে যে শুধু বদ্ধ হয় তা নয়, ঐ বদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এ-জন্যই দেখা যায় যে সাধারণ মানুষ নতুন চিন্তাকে সহজে গ্রহণ করতে চায়না। এই যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নিরাপত্তাবোধ, এটি কিন্তু কাল্পনিক নিরাপত্তা, মানুষ কল্পনা করে যে সে এই ব্যবস্থাতেই নিরাপদ। কল্পনা কেন ? কারণ নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থাই একটি স্থাণু বিষয় অথচ জীবন গতিময়, চলমান। মানুষ স্থিতিশীল মন নিয়ে গতিশীল জীবনের মুখোমুখি হয়ে সমস্যায় পড়ে। পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখলেই একটি অ-নিরাপত্তাবোধ মানুষকে গ্রাস করে। এই অ-নিরাপত্তাবোধ থেকেই উপস্থিত হচ্ছে আতঙ্ক। এবং এ-থেকেই ক্রোধ ঘৃণা

ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "মতান্ধতা এক মানসিক রোগ বিশেষ।"

এখানে একটি আরও বড় সমস্যা দেখা দেয়। মতবাদ যদি মতান্ধতার সৃষ্টি করে, এবং পরিণামে আতঙ্ক ও হিংসার জন্ম দেয়, তাহলে কি ধরে নেব যে আদর্শের (Ideology) কোনও দরকার নেই? উত্তর হল—আদর্শের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এটি যেন কোন আধিপত্য (authority) স্থাপন না করে। মানুষ কোন মতকে সত্য বলে গ্রহণ করলে দোষ হয়না, কিন্তু সে যখন এটিকে "চরম সত্য" বলে মনে করে তখনই সর্বনাশের সূত্রপাত। মানুষ যদি তার মতবাদকে শেষ কথা বলে মনে না করে, সে যদি মনে রাখে যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছাত্র হয়ে থাকা উচিত, তখন তার মানসিক ধারা ততটা বদ্ধ থাকে না, খোলা মন নিয়ে সে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে। শর্তসাপেক্ষ মন (conditioned mind) কখনও সত্যকে আবিষ্কার করতে পারেনা, সে তাকে দেখতে চায় নিজের রঙে রাঙিয়ে। এই মন সত্যকে প্রকৃত রূপে (as it is) দেখতে চায়না, সে তার পছন্দমতো রূপে সত্যকে দেখতে চায়। মন না রাঙিয়ে বসন রঙানোর মতো। সত্য কোন theory নয়, কোন মতবাদ নয়, সত্য জীবন্ত। মানুষ কিন্তু জীবন্ত সত্যকে দেখতে ভয় পায়। কেন? চিন্তার স্বভাবে ত্রুটি থাকায়। চিন্তার উৎস স্মৃতি, অর্থাৎ অতীত। এই অতীত থেকে এটি কখনও ভবিষ্যতে উল্লম্ফন করে, যার অন্যনাম কল্পনা। চিন্তা এভাবে প্রধানত অতীত এবং অংশত ভবিষ্যৎকে নিয়ে মশগুল, সে যখন বর্তমানকে দেখে তখন তাকে অতীতের অভিজ্ঞতার মানদণ্ড দিয়ে পরীক্ষা করতে চায়, অতীতের ধারার সাথে মিলিয়ে দেখতে চায়। সাধারণ মন এভাবেই কাজ করে। এই বদ্ধজলাভূমি থেকে উত্তরণের উপায় নিজের বিশ্বাস-অভ্যাসকে যাচাই করে দেখা; পরীক্ষা করা, বিশ্লেষণ করা।

এ-জন্যই বিপ্লবের প্রথম কাজ নিজের চেতনায় বিপ্লব আনা। সমাজের দোষ দূর করব অথচ নিজের দোষ দূর করবনা—এটা সুবিধাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি, বিপ্লবীর নয়। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও" এই কথা তো শুধু ধর্মক্ষেত্রের জন্যই নয়, সমাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রের জন্যও।

এক মানুষ, দুই সত্তা

এখন প্রশ্ন, মানুষ গড়া ও চরিত্র গঠন, এই দুটির ওপর স্বামীজী বিশেষ

জোর দিয়েছেন। এর মূল তাৎপর্য কি? বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের পক্ষে এভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব কি?:

Man making and Character building-মানুষ গড়া ও চরিত্র গঠন—এই দুটির ওপর নজর না দিয়ে শুধু সমাজ-ব্যবস্থা বদলিয়ে বিশেষ লাভ নেই। কারণ সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের ওপর এবং শুধু পুলিশ দিয়ে সমাজকে রক্ষা করা যায়না। স্বামীজী "মানুষ গড়া" বলতে বুঝিয়েছেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং চরিত্র গঠনের অর্থ ভয় ও প্রলোভনের সামনে মাথা নত না করা।

সত্যি কথা বলা, চুরি না করা, অন্যের ক্ষতি না করা ইত্যাদি সৎ চরিত্রের লক্ষণ, কিন্তু স্বামীজী শুধু এগুলির ওপর জোর দেননি। তিনি বলেছেন: গরু মিথ্যা কথা বলে না, রেলগাড়ি বে-লাইনে চলেনা, কিন্তু তা বলে এগুলি সৎ হয়ে যায় না। মানুষ অন্যায় কেন করে? কেন ঘুষ খায়? মিথ্যা কথা বলে কেন? হিংসা কেন করে? প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সে এগুলি করছে ভয়বশত অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে। সুতরাং ভয় ও প্রলোভনই সব অন্যায়ের মূলে। এই দুইটিকে জয় করতে না পারলে মানুষ এগুলির কাছে নতিস্বীকার করে। ভয় ও প্রলোভন—এ-দুটি বহির্জগতে যেমন দেখা যায়, তেমনি অন্তর্জগতেও। লোকভয়, রাজভয়, নিরাপত্তার ভয় ইত্যাদি যেমন আছে, মনের কল্পনা-বাসনাও তেমনি আছে। বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের এই ভয়-প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টাকেই স্বামীজী চরিত্রগঠন বলেছেন।

মানুষ গড়ার অর্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। নিজের চরিত্র গঠন করেও একজন ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারেন। এ-রকম ভালমানুষ সমাজে রয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী এইরকম ভালমানুষীর কোন মূল্য দেননি। তাঁর মতে, নিজস্ব চরিত্র গঠন করে একে সমাজে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে। এই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠাই "ব্যক্তিত্বের বিকাশ" স্বামীজী যাকে বলেছেন "মানুষ গড়া"। চরিত্র গঠন ও মানুষ গড়া—এই দুইয়ের সম্মিলনেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়।

হিটলার-খোমেনি-স্তালিন-পলপট-পিনপিয়াও—এদের দিকে তাকালে বোঝা যায় চরিত্র গঠন না করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটলে কি দুরবস্থা হয়। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক নেতারাও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার প্রাত্যহিক জীবন বন্ধু-আত্মীয়দের মধ্যে অনেককেই পাওয়া যাবে যারা ব্যক্তি-জীবনে সৎ ও নির্লোভ, কিন্তু সামাজিক-রাজনৈতিক অনাচার দূর করতে

এগিয়ে যাননা। বর্তমানে বুদ্ধিজীবী—বিশেষত শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে এরকম মানুষ দেখা যায়। এরা ব্যক্তিজীবনে ভালমানুষ হতে পারেন, কিন্তু এদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়নি।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় এ-রকম মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব কিনা—এ-প্রশ্ন তাদেরই মনে জাগে যাদের আত্মবিশ্বাস কম। সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থায় যে-কেউই ভাল হয়ে উঠতে পারে, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও গড়ে উঠতে পারার মধ্যেই মানুষের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানের চেয়ে অনেক খারাপ সমাজব্যবস্থা ছিল পরাধীন ভারতে, অথচ সে-যুগেই মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলেন ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখেরা। তাছাড়া বর্তমানের সমাজ-ব্যবস্থায় সব লোকই যে খারাপ তা তো নয়! আমরা আগেই আলোচনা করেছি—সমাজ-ব্যবস্থার দোহাই দেওয়া একধরণের অদৃষ্টবাদ।

ব্যক্তির দুটি সত্তা, সামাজিক এবং ব্যক্তিক। এই দুয়ের সমন্বয়েই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রভাব পড়ে এবং তার মানসিকতায় এর ছাপ দেখা যায়। এটিই ব্যক্তির সামাজিক সত্তা। সমাজ যেমন ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব ফেলে, আবার সেই ব্যক্তিই সমাজের প্রভাবকে অতিক্রম করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যার মানসিক শক্তি বেশি তার মধ্যে সামাজিক সত্তার থেকে স্বকীয় সত্তাই বেশি কার্যকরী। বড় বড় নেতা, সাহিত্যিক বিজ্ঞানী, মহাপুরুষ—এদের মধ্যে এই স্বকীয় সত্তাই প্রধান। অতএব যদি দেখা যায় কোন মানুষের মধ্যে সামাজিক প্রভাব বেশি, বুঝতে হবে তার মানসিক শক্তি কম।

বর্তমান সমাজে এই দুর্বলতাই ব্যাপক হয়ে উঠেছে। যার পরিণতি সমাজের সর্বস্তরে—সাহিত্য, রাজনীতি, সংবাদপত্র-জগৎ, সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির করতলগত। এক অন্ধ আনুগত্য প্রবণ সম্পর্কজাল গড়ে উঠেছে, যেখানে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই। এখানেই বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারার গুরুত্ব। ভারতীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করব আমরা।

ভারতীয় সমাজ ও তাঁর বিন্যাস প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁর চিন্তাধারা ও বক্তব্য রেখে গেছেন বিভিন্ন রচনা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে। এ-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ সমাজ-মানস বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সমাজের মূল পরিচালিকা শক্তি, গণচেতনার স্তর, অন্য জাতির প্রতি মনোভাব ইত্যাদি

পর্যালোচনা করে সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস করেছেন। সমাজের নানা সমস্যা বিশ্লেষণ করার জন্য তিনটি দিক বিচার করা দরকার। প্রথমত, সমাজে কোন কোন শক্তি কিভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে; দ্বিতীয়ত, বৃহত্তর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে ব্যক্তি স্তরে মানুষের বৈশিষ্ট্য কি ধরণের এবং তৃতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কি আকারে আছে। এই তিনটি বিষয় আলোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে সংকটের মূল চরিত্র।

দুই : সমস্যার গতি প্রকৃতি

আজকের সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠছে। কি জাতীয় ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক সর্বগ্রাসী দুঃস্বপ্ন ক্রমশই যেন জনমানসে কালো ছায়ার বিস্তার ঘটিয়ে চলছে। সাময়িক ব্যবস্থা দিয়ে কি এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়কে রোধ করা যাবে? সমস্যার গভীরে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে মূল কারণগুলিকে এবং সেই সাথেই প্রয়োজন এক বলিষ্ঠ সমাজদর্শন ও জীবনদর্শনের যাতে ব্যবহারিক স্তরে পথ পাওয়া যায়।

আশা ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর। সমাজের বিবেককে জাগ্রত রাখাই বুদ্ধিজীবীর প্রধান দায়িত্ব। নতুবা শুধু বুদ্ধিকে আশ্রয় করে পশু-পাখী কিংবা তস্করও জীবিকা নির্বাহ করে, কিন্তু সেজন্য কি এদের বুদ্ধিজীবী বলা যায়? একদিকে চটুল পত্রিকার কলুষ রুচির বাতাবরণ, অন্যদিকে সরকারী পুরস্কার ও অর্থের হাতছানিতে বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীর দল সমাজের বাতাসকে ভারী করে তুলেছেন। নতুন সভ্যতার দিকদর্শনে বিকল্প চিন্তা ও পথের উদ্ভাবনী শক্তি কোথায় তাদের মধ্যে?

শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের মাস-মাইনে মকুব হল অথচ স্কুল-কলেজে পড়াশোনা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর নেই। ফলে শিক্ষা তাদের জীবনে কোন সদর্থক ভূমিকা নিতে পারছে না। কিছু সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া রয়েছে ঠিকই কিন্তু সরকারী নাগপাশে স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ কোথায়? ফলে ভাল ছাত্রেরাও ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, শিক্ষা তাদের জীবনে সৃজনশীলতার বদলে টেলিভিশন-ফ্রীজ-গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদি অর্জনের উপায় হয়ে উঠছে।

পাঞ্জাব-আসাম-নাগাল্যাণ্ড-কিংবা দার্জিলিঙে যে সমস্যা সেটি তো শুধু অর্থনৈতিক নয়, এদের প্রধান সমস্যা সাংস্কৃতিক। নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখেও কিভাবে বৃহৎ ভারত-সংস্কৃতির একাত্ম হওয়া যায় সে প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দানা বাঁধছে। এবং এই মৌল সাংস্কৃতিক সমস্যার ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরাও নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

একদিকে যেমন এই জাতীয় সমস্যাগুলি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে আন্তর্জাতিক সমস্যা। রাশিয়া ও আমেরিকার প্রাধান্য সৃষ্টির প্রয়াসে বিশ্বশান্তি বার বার ব্যাহত হচ্ছে। আজকের মানবসভ্যতার সব চেয়ে বড় দুই শত্রু—রাশিয়া ও আমেরিকা। বিভিন্ন দেশে পুতুল-সরকার বসিয়ে ও অন্যান্য দেশের ওপর নানারকম চাপ সৃষ্টি করে, এবং সেই সাথে ব্যাপক অস্ত্রব্যবসা ফেঁদে এরা পৃথিবীর অবস্থা ক্রমশই অগ্নিগর্ভ করে তুলছে।

সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

সাম্প্রতিক বিশ্বে ছয়টি বড় বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। প্রথমত, যুবসমাজের আয়তন বৃদ্ধি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্বপূর্ণ অথচ অসহায় ভূমিকা। ইওরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৯৬৮-৬৯ সালে ছাত্রবিক্ষোভ, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ইরানে শা'র পতন, ভারতে নকশালপন্থী আন্দোলন, জয়প্রকাশের নেতৃত্বে আন্দোলন, ভিয়েৎনামের ব্যাপারে মার্কিন তরুণদের প্রতিবাদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যুবশক্তির সম্ভাবনা ও তীব্রতা। ঐ দেশগুলিতে সামাজিক চেতনার এক লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এনেছিল যুবশক্তি, কিন্তু সেই সাথে এটিও দেখা গেল যে বিদ্রোহ বা বিক্ষোভের শেষে নেতৃত্ব চলে গেছে সাবেকী ধ্যানধারণার বয়স্ক মানুষদের হাতে, যুবসমাজ এতে লাভবান হয়নি।

দুই, মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীদের ওপর সরকারী অত্যাচার ক্রমশই বাড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও পরে পরমাণু-বৈজ্ঞানিকেরা, এবং এরও পরবর্তীকালে সলঝেনিৎসিন-শাখারভ নির্যাতিত হয়েছেন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে, ভারতে জরুরী অবস্থায়, দঃ ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট শাসনে, চিলিতে অ্যালেণ্ডে-সরকারের পতনের পর, বিহারে জগন্নাথ মিশ্রের আমলে এবং পঃ বঙ্গে জ্যোতি বসুর রাজত্বে, সর্বত্র মুক্তমতি বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণে উৎসাহ দেখিয়েছে গণতন্ত্রী-সাম্যবাদী সব দল ও সরকার।

তিন, বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি একই রকম আচরণ দেখাচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈষম্যবাদী ভেটো-ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা, বিদেশী রাষ্ট্রে পুতুল-সরকার বসানো, তৃতীয় বিশ্বের দেশ-গুলিতে অস্ত্র বিক্রয় করা, আমদানি রপ্তানির বাণিজ্য ক্রমাগত নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা, পররাষ্ট্রনীতিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিচয় দেওয়া, বিদেশী

রাষ্ট্রে জনসাধারণের বদলে সামরিক সরকারকে সমর্থন করা ইত্যাদি কাজে আমেরিকা-বৃটেন-ফ্রান্সের সাথে রাশিয়া-চীনের কোনও পার্থক্য নেই।

চার, প্রযুক্তি শিল্পের অভিনব উন্নতির সাথে সাথে ভোগবাদের বিকাশ, শহর থেকে গ্রামে এর প্রসার, এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কাছে এর আকর্ষণ। ইয়াংকি-ঢেউয়ের প্রভাব আজ রাশিয়া-চীনের তরুণ-সমাজেও জোরদার হয়ে উঠছে, অন্যান্য দেশগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। ভোগবাদের এই ব্যাপক প্রভাবের সাথে সাথে পাইয়ে দেবার রাজনীতি মানুষের চরিত্রকেই নষ্ট করে দিচ্ছে।

পাঁচ, মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক বর্তমান সমাজে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জয়েন্ট-স্টক কোম্পানী বা কোঅপারেটিভের মাধ্যমে মূলধনের গোত্রান্তর ও মালিকানা-পরিচালনার বিচ্ছেদ ঘটলেও মালিকের শোষণ একেবারে বন্ধ হয়নি, এবং ম্যানেজার ও শ্রমিকের সামাজিক ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থায় মূলধনে ব্যক্তিগত আধিপত্যের সুযোগ না থাকলেও মন্ত্রী-পরিচালক-শ্রমিকের মধ্যে যান্ত্রিক শাসক-শাসিত সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছে। দলীয় নেতারা নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বের মিশ্র-অর্থনীতির দেশগুলিতে অ-শ্রমিক শ্রমিক-নেতাদের দাপট, পাইয়ে-দেবার রাজনীতি ও কর্মবিমুখতা সামগ্রিকভাবে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ফলে এসব দেশে জনসাধারণের ওপর মালিক ও সংগঠিত শ্রমিকদের যৌথ শোষণ চালু হয়েছে।

ছয়, মানুষের মনে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা প্রকট হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পণ্যপ্রাচুর্যে ও মার্কসবাদী দেশগুলির স্বৈরতন্ত্রী শাসনে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ জনমানসকে দিশেহারা করে তুলেছে। আত্মিক সংকট থেকে মুক্তি দেবার জন্য নতুন জীবনদর্শনের অভাবে হতাশার দর্শন ও পলায়নী মনোবৃত্তি সব দেশে, সব ধরণের ব্যবস্থায়ই মানুষকে ক্রমশই গ্রাস করছে।

আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা ও জীবন জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতেই পথের সন্ধান করতে হবে আমাদের। এবং পথ অন্বেষণের জন্যই জাতির উৎস-পরিচয় ও পরম্পরাকে জানতে হবে। কার্ল মার্কস আদর্শ (ideology) বলতে কেবল শাসকশ্রেণীর চিন্তাধারাই বুঝতেন। কিন্তু আদর্শ গড়ে ওঠে স্থিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তার অবসানে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। Ideology তথা আদর্শ হচ্ছে বিশ্বদৃষ্টির এক ধারণা। স্বভাবতই বিশেষ শ্রেণী

ও গোষ্ঠী স্বকীয় সামাজিক স্থিতি ও মূল্যবোধের সীমাবদ্ধতার দরুণ এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজ বদলের দিশা সঠিকভাবে দিতে পারেন না। এই সীমাবদ্ধতা মার্কসীয় মতানুযায়ী বুর্জোয়া আদর্শের ক্ষেত্রে যেমন, সাম্যবাদী যে কোন প্রগতিশীল আদর্শের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজ ও জীবন বিশেষ আদর্শ ও মতবাদের চেয়ে বড় কিছু, মহান। সেজন্য আদর্শ হয়ে উঠতে হলেও বিশেষ সমাজের স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য, মনোভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন, শাসক মতবাদ ছাড়াও জাতির জীবনে একটি গভীর অন্তঃসলিলা চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যায় জনমানসে, আর এটিকেই তিনি বলেছিলেন জাতীয় বৈশিষ্ট্য। ইউং যাকে বলেছেন "collective unconscious"—গণমানসের সেই অবচেতন স্তরে গেলেই চেনা যায় এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে। ভারতীয়দের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম, বলেছিলেন স্বামীজী।

স্বামীজীর সমাজতন্ত্র ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়, আবার মানবতাবাদকে বাদ দিয়েও তাঁর ধর্ম নয়। আজ যখন একদিকে ধর্মের নামে গোঁড়া একদেশী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে নাস্তিক্যবাদের নামে মেকী প্রগতিশীলতা দেখা যায়, তখন স্বামীজীর ধর্মচিন্তার প্রয়োজন খুব বেশি করে অনুভূত হয়। ১৯৮৩-র জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা দূরদর্শনে প্রচারিত একটি আলোচনা-চক্রে একজন মুসলমান যুবককে প্রশ্ন করা হয়েছিল: তুমি ধর্মে মুসলমান হয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ নেতা হিসেবে কিভাবে গ্রহণ করেছ? উত্তরে সে বলেছিল: বিবেকানন্দকে হিন্দু বলাটা কি যথার্থ? তিনি তো কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা প্রচার করেননি, তিনি বারবার যে ধর্মের কথা তুলে ধরেছেন তা হল মানবধর্ম।

২০-৮-১৮৯৩ তারিখের এক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন: রাক্ষসে নৃশংস সমাজ তাদের (গরীবদের) ওপর যে ক্রমাগত আঘাত করছে তার ব্যথা তারা পাচ্ছে, কিন্তু তারা জানেনা কোথা থেকে ঐ আঘাত আসছে। লক্ষ্যণীয় বিষয়, স্বামীজী মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন আক্রমণকারী শক্তিগুলি সম্বন্ধে। ঐগুলিকে দমন না করলে তা আমাদের সব প্রয়াসকে নষ্ট করে দেবে।

আজ প্রয়োজন বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় সমস্যার সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার প্রয়োগ। এ জন্য সামাজিক বাস্তবতা

(social reality) এবং সামাজিক গতিপ্রকৃতি (dynamics of social change) সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার।

আজকের ভারতে অশিক্ষিতদের চেয়ে শিক্ষিতরাই বেশি সমস্যার সৃষ্টি করছেন। আসাম-সমস্যা, পাঞ্জাব-সমস্যা, গোর্খাল্যাণ্ডের দাবি, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা, পণপ্রথা ও বধূ-নিগ্রহ, রাজনৈতিক কদর্যতা—এসব তো অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের নয়, বরং শিক্ষিতদেরই সৃষ্ট সমস্যা। আর এর মূল কারণ মানসিক জড়তা, নতুন চিন্তা করায় অনীহা। আজ তাই মানুষ নতুন কোনও পথের কথা চিন্তা করতে পারেনা, শিক্ষিতরা পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের বিকল্প কোনও পথ উদ্ভাবন করতে পারেননা।

এ-সত্ত্বেও কিছু মানুষ সবসময়ই রয়েছেন যারা নতুন পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করেন, মানসিক জড়তার উর্ধ্বে উঠে বিশ্বকে নবদিগন্ত দেখাবার প্রয়াস পান। এ-রকম একজন মানুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। জাতির প্রাণসত্তা ও বিশ্ব-মানবাত্মার মর্মবাণীকে তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠেছিলেন, সে-সব বিষয় আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরও উপলব্ধি করা প্রয়োজন—প্রয়োজন আমাদের নিজেদের স্বার্থেই।

স্বামী বিবেকানন্দ যে-কোন সংকটকেই গভীরে গিয়ে বিচার করার কথা বলেছেন। সামাজিক বাস্তবতা (social reality) ও সামাজিক গতিপ্রকৃতিকে (social dynamics) বিচার করতে বলেছেন একটি সংকটকে বিশ্লেষণ করার সময়। মানুষের দুটি সত্তা—ব্যৈক্তিক (individual aspect) ও সামাজিক (social aspect)। এই সত্তা দুটি কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, এগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধছে কি-না, এবং বাঁধলে তা কি-ধরণের—এ-সব বিষয়ের ওপর জোর দিতে বলেছেন তিনি।

সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

স্বামীজী যে চার ধরণের ব্যক্তি-মানসিকতার উল্লেখ করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এর মধ্যে বৈশ্য-মানসিকতার দ্রুত প্রসার ঘটছে সমাজে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই বিভাগ স্বামীজী জন্ম বা বংশকে ধরে করেননি, করেছেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মের দিক থেকে। বৈশ্য-মানসিকতা অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, সব সংকটের মূলে অর্থনৈতিক কারণ খুঁজতে চায় এবং অর্থনৈতিক সমাধানকেই একমাত্র সমাধান বলে মনে করে। ভারতের

প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় সরকার ভারী শিল্প ও কৃষির ওপর নজর দিলেন এবং নিত্যব্যবহার্য পণ্যের (cosumer goods) দায়িত্ব বে-সরকারী হাতে ছেড়ে দিলেন। নতুন স্বাধীন দেশের পক্ষে এ-ছাড়া বিশেষ কিছু করার থাকে না, কারণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (Infra-structure) গড়ে তোলা আবশ্যক। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, ব্যবসায়ীরা ও শিল্পপতিরা এমন সব ভোগপণ্য তৈরীতে উৎসাহিত হলেন যা প্রধানত উচ্চবিত্তেরা ব্যবহার করেন। এ-সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নজর কাড়ল রাজনৈতিক দলগুলির ও ব্যবসায়ীদের। যেহেতু মধ্যবিত্তেরা সমাজের সবচেয়ে সরব গোষ্ঠী, সেহেতু বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলি এদের সামিল করল বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার মাধ্যমে এবং সরকারপক্ষও পাইয়ে-দেবার-রাজনীতির মাধ্যমে এদের হাত করতে চেষ্টা করল। স্বাধীনতার পরেই সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার এবং শিক্ষা ও পেশার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের specialization-এর ফলে মধ্যবিত্তের আয়তন প্রসারিত হয়েছে। সেই সাথে ব্যবসায়ীরা দেখলেন, ভোগ্যপণ্য তৈরী করে উচ্চবিত্তের সাথে মধ্যবিত্তদেরও আকর্ষণ করা দরকার বিস্তৃত বাজারের ও বেশি লাভের জন্য। এই তিন পথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শুধু প্রসারই ঘটল না, সেই সাথে এদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হল। এবং এভাবেই সমাজে ভোগবাদের (consumerism) ব্যাপক প্রভাব দেখা দিল।

একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার ও অন্যদিকে ভোগবাদের ব্যাপকতা, এই দুইয়ের ফলে গড়ে উঠল এক নব্য-ধনী সম্প্রদায়। এরা যে সবাই অন্যান্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর মতো নব্য-ধনী হল তা নয়, আসলে মানসিকতার দিক দিয়েই এদের এই নামকরণ। বাবা হয়ত ছিলেন স্কুল-শিক্ষক বা কেরাণী বা ছোট ব্যবসায়ী, কিন্তু নতুন প্রজন্মের মানুষেরা পেশার দিক থেকে তা পরিত্যাগ করলেন, (বর্তমানের মধ্যবিত্তদের কয়েকটি পেশা উল্লেখ্য— মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, হাসপাতালের ডাক্তার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারী ও বে-সরকারী ফার্মের ইঞ্জিনীয়ার, সরকারী প্রশাসক, প্রাইভেট ফার্মের চাকুরে, প্রাইভেট টিউশ্যানীতে ব্যস্ত স্কুল-শিক্ষক, ব্যাঙ্ক-জীবনবীমা ইত্যাদির কেরাণী, ছোট ও মাঝারী রাজনৈতিক নেতা, বড় পত্রিকার সাংবাদিক ইত্যাদি ইত্যাদি), সেই সাথে এদের ক্রয়ক্ষমতাও গেল বেড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জীবনমানের উন্নতি হল। টেলিভিশন-স্কুটার-ফ্রীজ ইত্যাদির ব্যবহার দ্রুত বেড়ে গেল। সেই সাথে জীবন সম্পর্কে

দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হল। পাশ্চাত্য ধরণের সমাজের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল।

আগে যেগুলি ছিল বিলাস-দ্রব্য সেগুলি হয়ে উঠল নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এগুলির দরকার নেই এ-কথা বলছি না; বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন, প্রেশার কুকার, ভ্যাকুয়াম ক্লীনার, ফ্রীজ ইত্যাদি নিশ্চয়ই দরকার, কারণ বাড়ির মহিলারা দিনের বেশির ভাগ সময় রান্না, কাপড়-কাচা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদিতে কাটান, এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল—এসব ইলেক-ট্রনিক গ্যাজেটের সাহায্যে কাজের সময় কমছে ও অবসর সময় যে বাড়ছে, এই অতিরিক্ত অবসর সময় কাজে লাগানো হচ্ছে কিভাবে? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: মানুষের চেতনা তিনটি স্তরে বিধৃত—দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক। সাধারণভাবে মানুষ আত্মিক স্তরে (ধর্ম, জীবন-জিজ্ঞাসা, বিশ্ব-চেতনা ইত্যাদির স্তর) সবসময় মন রাখতে না পারলে অন্তত মানসিক স্তরে (মননশীলতার স্তর) মন যেন রাখে, নাহলে মন স্বাভাবিকভাবেই দৈহিক চেতনায় নেমে আসবে—বলেছিলেন স্বামীজী। বর্তমানে ঠিক এটিই দেখা যাচ্ছে সমাজে। অবসর সময়ে যেহেতু মানুষ মানসিক স্তরে তার চেতনাকে রাখতে পারছে না (প্রমাণ হিসেবে যে-কোন লাইব্রেরীতে গিয়ে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সিরিয়াস বইয়ের পাঠক কজন আর সস্তা উপন্যাসের গ্রাহক কজন, যে-কোন ম্যাগাজিন-কর্ণারে সিরিয়াস ম্যাগাজিনের চেয়ে সিনেমা-পত্রিকা কত বেশি বিক্রী হয়!) এ-জন্যই অবসর সময়ের বেশির ভাগই কাটছে দৈহিক স্তরের বিনোদনে—সিনেমা, ড্রিংক্স্, তাসখেলা, নেশা করা ইত্যাদিতে। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনমান, শিক্ষার হার বাড়লেও মননশীল-চর্চার হার সে-তুলনায় খুবই কম।

এই নব্য-ধনী মানসিকতা তথা আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ জন্ম দিয়েছে অর্থ-নৈতিক দুর্নীতির। একদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে আমলা ও কেরাণীকুল—সরকারী ও বে-সরকারী মহলে ব্যাপক ঘুষের নিয়ম চালু করেছেন, এই সাথে ব্যবসায়ীরা একে সমর্থন জুগিয়ে অসৎ মানুষের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। যদিও বেকার ও ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার তরুণ পরিচালকেরা এই কাজে যুক্ত হয়েছেন, তবুও অর্থনৈতিক দুর্নীতির মূল উৎস রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। কাজ না করা ও ঘুষ নেবার মানসিকতা মধ্যবিত্ত সমাজকে কিভাবে গ্রাস করেছে তা জানার জন্য বিভিন্ন সরকারী অফিসে

একদিন ঘুরে আসাই যথেষ্ট। এই মানসিকতাই (অর্থাৎ কাজ কম করা ও অতিরিক্ত উপার্জন করা) ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে মধ্যবিত্ত কর্মীই বেশি।

এই যে বৈশ্য মানসিকতার প্রসার এটা যে সম্পূর্ণ খারাপ তা নয়, পার্শি-পাঞ্জাবী-মারোয়াড়ী ইত্যাদি সমাজে এটি বেশ কিছু ভাল ফল রেখেছে, এ-সব সমাজকে উন্নতও করেছে। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে এই সুফল বিশেষ দেখা যাচ্ছে না কেন ? অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত অর্থ দুইভাগে ব্যবহার করা যায় —উৎপাদক এবং অনুৎপাদক পথে। ব্যবসায়ীরা এই টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ে, ফলে অর্থ সবসময় চক্রহারে ঘুরতে থাকে এবং সামাজিক সুফল নিয়ে আসে, কারণ ব্যবসার বিস্তৃতির সাথে সাথে কর্মবিনিয়োগ ও পণ্য-উৎপাদনের সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালী উদ্বৃত্ত অর্থ খরচ করে বেশির ভাগই অনুৎপাদক খাতে। ব্যাঙ্ক-পিয়ারলেস-সঞ্চয়িতা ইত্যাদিতে এদের যে সঞ্চয়-প্রবণতা দেখা গিয়েছে তার পেছনে আছে কিছু ঝুঁকি না নিয়ে টাকা বাড়ানোর মনোভাব।

বৈশ্য মানসিকতার প্রসারের সাথে আরেকটি প্রবণতা বা দ্বন্দ্বও লক্ষ্যণীয়। এটি হল সনাতন ও আধুনিক মূল্যবোধের সংঘর্ষ। এটা ঠিক কথা যে মূল্য-বোধের পরিবর্তন ঘটে এবং অতীত মূল্যবোধকে সব সময় আঁকড়ে ধরে রাখার কোন অর্থ নেই। কিন্তু আজকের সমস্যা হল—পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু সুচিন্তিত নতুন মূল্যবোধ তৈরী হচ্ছে না। গত শতাব্দীতে ব্রাহ্ম-সমাজ বহু পুরনো মূল্যবোধকে বাতিল করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে নতুন মূল্যবোধকে সামনে এগিয়ে দিয়ে সমাজকে নতুন দিশা দিয়েছিল। যদি এই নতুন মূল্যবোধকে তৈরী না করে পুরনোগুলিকে ভেঙে ফেলা হয় তবে সমাজে দেখা দেয় Psychological neurosis—বলেছেন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এরিকসন্। ইউং বলেছিলেন : ঐতিহ্য অনুযায়ী মূল্যবোধ যদি নতুন সামাজিক চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে না পারে তবে সামাজিক সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পেছনে যে অনন্ত নির্ঝ'রিণী প্রবাহিত, প্রাণভরে তার জল পান কর, তারপর সামনে প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে যাও। ভারত প্রাচীনকালে যে উঁচু শিখরে ছিল, তাকে তার চেয়েও উঁচু, উজ্জল, মহৎ, আরও মহিমামণ্ডিত করার চেষ্টা করো।"[১]

অর্থাৎ স্বামীজী প্রাচীনকালের জীবনবোধের সাথে মিলন চাইছেন নতুন মূল্যবোধের। বর্তমানের সনাতন ও আধুনিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, কারণ এ-দুটিকে মানুষ বিপরীত চরিত্রের ভাবছে। ধর্ম বলতে সাধারণ পুজো-আর্চা ও মতান্ধতাকেই প্রধান মনে করছে। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, "আধ্যাত্মিক চিন্তার সাহায্যে জগদ্‌বিজয় বলতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বগুলির প্রচারকেই লক্ষ্য করছি, শত শতাব্দী ধরে আমরা যে কুসংস্কারগুলিকে ধরে রেখেছি সেগুলি নয়।"[২]

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দুটি সামাজিক শক্তি বা ক্রিয়ার কথা বলেছি। প্রথমত, বৈশ্য মানসিকতার দ্রুত প্রসার। দ্বিতীয়ত, নতুন মূল্য-বোধ তৈরী না হওয়ায় চারিত্রিক দ্বন্দ্ব। এবারে পারিবারিক ক্ষেত্রে—বিশেষত সন্তান মানুষ করার ব্যাপারে মূল সমস্যাগুলি আলোচনা করব।

পারিবারিক ক্ষেত্র

সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে বাড়িতেও এমন বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে যা ছেলে-মেয়েদের জীবনে সুস্থ প্রভাব গড়ে তোলার প্রতিকূল।

প্রথমে ছেলেদের কথাই ধরা যাক। অধিকাংশ মা-বাবাই চাইছেন, তাদের সন্তান ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার-সি. এ-আই. এ.এস হোক। এবং এই ধারণাটাই ছোটবেলা থেকে সন্তানের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি ভাল, যদি তা সমাজসেবার দিকে তাকিয়ে করা হত। কিন্তু এটি করা হচ্ছে ভবিষ্যতের কর্মজীবনের দিকে তাকিয়ে, সমাজস্বার্থকে গৌণ করে। অল্প বয়স থেকেই Careerism-এর বীজ দানা বাঁধছে ছেলেদের মনে। ফলে যার ছবি আঁকতে ভাল লাগে সে বিজ্ঞান পড়ছে, যার ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ঝোঁক সে কমার্স পড়ছে। এভাবে যে-বয়সে মন থাকে তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ, সেই বয়সেই Careerism তাদের আকৃষ্ট করছে এবং মুক্ত সৃজনশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, এভাবে বহু ছেলে আবার পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে না এবং শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

জীবনে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য টাকা নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু টাকার ওপরই যদি সমস্ত লক্ষ্য থাকে তবে সেই জীবনে অনেক কিছুরই অভাব ঘটে। তরুণ বয়সের অনুভূতিপ্রবণ মনে যদি সৃজনশীলতা, মুক্তচিন্তা ও সুসমঞ্জস জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না করা যায়, যদি শুধু অর্থসর্বস্বতার

দিকেই পরিচালিত করা হয়, তবে মানুষ শিক্ষাকে নেতিবাচক পথে কাজে লাগাবেই। এজন্যই দেখা যায়, বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মারণাস্ত্র আবিষ্কার করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী প্রযুক্তিবিদরা বের করছেন খাবারে ভেজাল দেবার ফর্মুলা, আইনজীবীরা জেনে শুনেও দুর্বৃত্তকে বাঁচাবার জন্য আইনের কূটজাল বিস্তার করছেন, বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক মত্তাত্ততার কাছে দাসখৎ লিখে দিচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন, "কয়েকটা ডিগ্রী পেলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের চোখে সে শিক্ষিত হলো ? যে বিদ্যার বিকাশে মানুষকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, স্বার্থত্যাগ, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সেটা কি আবার শিক্ষা ?"

এবারে মেয়েদের দিকে তাকানো যাক। ছোটবেলা থেকেই তাদের এমনভাবে মানুষ করা হচ্ছে যেন বিয়ে করাটাই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তাদের পড়ানো হচ্ছে, নাচ-গান শেখানো হচ্ছে—সবকিছুরই লক্ষ্য বিয়ের ভাল পাত্রী করে তোলা। অনেক মা-বাবাই সচেতন বা অবচেতনভাবে মেয়েদের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেন। ফলে ছোটবেলা থেকেই এক-ধরণের হীনমন্যতা মেয়েদের মনে দানা বাঁধে। শারীরিক দুর্বলতা ততটা ক্ষতি করে না, কিন্তু মানসিক দুর্বলতা মারাত্মক, এতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

আরেকটি বিষয় এরই সাথে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। সন্তানের দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে কথায় কথায় সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করা হচ্ছে। নব্য প্রজন্মের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে যে তাদের কোনও দোষ নেই, যত দোষ সমাজব্যবস্থার। এভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এরা হারিয়ে ফেলছে। সবকিছুর জন্য সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করা আধুনিক অদৃষ্টবাদ। এই যে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া, আত্মবিশ্লেষণ না করা, নিজের অক্ষমতাকে চাপা দেওয়া—এতে কার ক্ষতি হচ্ছে ? যারা অভিযোগ করে তাদেরই। মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক দুর্নীতি, সবই আছে। কিন্তু আমি কেন পারব না এগুলির থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে ? যদি না পারি, তবে কি শুধু সমাজই দায়ী ? এই দুর্নীতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থাকে যদি ব্যক্তিগত জীবনচর্যা দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা না করি, তবে কি আমিও দায়ী নই এই দুর্নীতিকে সহ্য করে যাবার জন্য ? ভাল

পরিবেশে সবাই ভাল হতে পারে, কিন্তু খারাপ পরিবেশেও যে মানুষ উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে তারই মনুষ্যত্ব সার্থক। সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করে মানুষ আসলে নিজের দায়িত্ব এড়াতে চায়, নিজের অক্ষমতাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই এই সমাজব্যবস্থায় ছেলে-মেয়ে মানুষ করা কঠিন, তবে মা-বাবার কি কর্তব্য নয় এই সমাজব্যবস্থা বদলাবার জন্ম সন্তানকে বিপ্লবী হতে শিক্ষা দেওয়া? আর প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া কি সম্ভব, চরিত্রবল-সৃজনশীলতা-আত্মত্যাগকে বাদ দিয়ে?

ব্যক্তি-সমাজের সম্পর্ক বিন্যাস

আগেই বলা হয়েছে, মানুষের দুটি সত্তা—ব্যৈক্তিক ও সামাজিক। উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে অন্যের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে উদাসীন হলে ব্যক্তিত্ব খর্বিত হয়। মানুষের যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য চাই, তেমনি সমাজ ও পরিবেশের একটা ভূমিকা আছে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলায়। এটাকে অস্বীকার করলে সমাজের সাথে ব্যক্তির সংঘাত অনিবার্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংশ্লেষ চেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন—ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি গণতন্ত্রের উৎসাহ যেমন যৌক্তিক, সমাজতন্ত্রী কথিত যৌথস্বার্থও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে বাবার অস্তিত্ব যেমন স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে নিয়েই, এদের অস্তিত্বকে গৌণ করে বাবার অস্তিত্বকেই "একমেব" করে তুললে সাংসারিক শান্তি ব্যাহত হয়। আবার নিজের অস্তিত্বকে গৌণ করে তুলে সম্পূর্ণ স্ত্রৈণ বা পুত্রস্নেহে-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র হয়ে উঠলেও মুস্কিল। সমাজেও একই ব্যাপার। ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হবে, এবং সেই সাথে সমাজের প্রতি ব্যক্তির যে একটা দায়িত্ব আছে তাও পালন করতে হবে। এই ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক-সত্তার মধ্যে যদি সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তখনই শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। এই দ্বন্দ্ব যেমন সমাজ জীবনে দেখা দেয়, তেমনি ব্যক্তি জীবনেও।

বর্তমান ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছে, যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি। আগেই আমরা দেখেছি, সমাজ-জীবনে বৈশ্য-মানসিকতার প্রসার ও পারিবারিক জীবনে Careerism-এর প্রভাব বাড়ছে। এই দুই প্রবণতা মানুষের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা (ambition) নিয়ে আসছে

কিন্তু সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে না। মানুষ তার সমস্যাগুলিকে ব্যক্তিস্তরেই দেখছে, সামাজিক স্তরে অনুরূপ সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ—যিনি অফিসে ঘুষ নিচ্ছেন তিনি চিন্তা করছেন না যে এই প্রবণতাকে ঠেকাতে না পারলে তিনি যখন অন্য কোনও অফিসে যাবেন ব্যক্তিগত কাজে তখন তাকেই ঘুষ দিতে হবে। জীবন-বীমা অফিসে যিনি কাজ না করে জনসাধারণকে কষ্ট দেন, তিনি বুঝতে পারছেন না যে অবসর গ্রহণের পর তাকেও পেনসন আনতে গিয়ে কষ্ট করতে হতে পারে। যে রাজনৈতিক নেতা গুণ্ডা দলের সাহায্যে বিরোধী মানুষকে দমন করেন, তিনি ভাবেন না যে আগামীকাল তাকে দমন করার জন্য বিরোধীরাও গুণ্ডার সাহায্য নিতে পারে। যিনি নিজের ছেলের বিয়েতে পণ নেন, তিনি চিন্তা করেন না তার মেয়ের বিয়ের কথা। কেউ কেউ আবার এ-নিয়ে চিন্তা করলেও এ-সব আচরণ বর্জন করেন না এই অজুহাতে যে তিনি সৎ হলেও অন্যান্য লোক সৎ হবে না, এবং এভাবেই পরাজিত মনোভাব নিয়ে তিনিও স্রোতে গা ভাসান। ফলে শেষ পর্যন্ত "সমাজের যা-হয় হোক, আমায় ভাল হলেই হল" এই মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে সমাজের অবস্থা যদি ক্রমশই অধোগামী হয় তবে তার পক্ষে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা মুস্কিল, কারণ ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে সমাজেরই অঙ্গ।

মানুষের মূল দ্বন্দ্ব তার ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক সত্তার মধ্যে অসামঞ্জস্য। বেঁচে থাকতে গেলে মানুষকে কতগুলি সামাজিক প্রভাবের মধ্যে থাকতেই হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে শ্রেণীগত-জাতিগত-ধর্মীয়-ভাষাগত-পেশাগত ইত্যাদি সম্পর্ক, মানুষ দল বাঁধে। এই যে সামাজিক-সত্তা এটি স্বাভাবিক-ভাবেই গড়ে উঠলেও মানুষ চায় তার ব্যক্তি-সত্তার যথাযথ প্রকাশ। আলোচনার একেবারে প্রথমদিকে আমরা দেখেছি সব মানুষই দুটি বিষয় চায়—দৈহিক অস্তিত্ব এবং মানসিক পূর্ণতা। সামাজিক-সত্তা তাকে দেয় প্রথমটির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কিন্তু মানসিক পূর্ণতা আসে ব্যক্তি-সত্তায়, যেখানে মানুষ অনন্য হতে চায়। কেউ-কেউ অবশ্য সামাজিক-সত্তার মধ্যে তার পূর্ণতা খুঁজে পেতে চায়, কিন্তু সমস্যা হল এর ফলেই আসে দলীয় আনুগত্য যার পরিণাম বিভিন্ন ধরণের সংকীর্ণতা। তাছাড়া এ-ধরণের আনুগত্যের ফলে মানুষ শেষে প্রভু-দাসের সম্পর্কের স্তরে চলে যায়। ব্যক্তি-সত্তার প্রকৃত প্রকাশ ঘটে সৃজনশীলতার মাধ্যমে। বর্তমান সমাজে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে

সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটলেও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে দেখা যায় অর্থনৈতিক দিক থেকে মানুষ তার সীমিত ক্ষেত্রে অনন্য হতে চাইছে। সমাজে সে স্বীকৃতি চাইছে আর্থিক শক্তির মাধ্যমে।

পণপ্রথায় বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া

সামাজিক, পারিবারিক, ও ব্যক্তিগত স্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কতগুলি উল্লেখ করা হল। এবারে দেখা যাক এগুলি কিভাবে বিভিন্ন সমস্যা টিঁকিয়ে রাখছে ও ক্রমশ জোরালো করে তুলছে। এসব সমস্যার একটি, যেমন পণ-প্রথার আলোচনাকালে রবিবারের সংবাদপত্রে যে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সেদিকে তাকানো যাক। সম্প্রতি আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা থেকে যা দেখা গেছে তার ছবিটা এরকম— শতকরা ৬১ জন স্ব-বর্ণের পাত্র-পাত্রী চেয়েছেন, ২৭·৬% নিজের জাতি-গোত্র বলেছেন কিন্তু সবর্ণ অসবর্ণ পাত্র-পাত্রী চান কিনা সেকথা খুলে বলেননি, ১১·২% বিজ্ঞাপনদাতা জানিয়েছেন যে-কোন বর্ণ চলবে, ০·২% নিজের বর্ণ জানাননি এবং জানিয়েছেন বর্ণ কোন বাধা নয়। নমুনা হিসাবে যে ২৩৩টি বিজ্ঞাপন বেছে নেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে মাত্র একজন অসবর্ণ চেয়েছেন। আমরা আগে যে-কথা আলোচনা করেছিলাম—পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু নতুন মূল্যবোধ তৈরী হচ্ছে না···এর ফলে আসছে সংকট। পুরনো ভাবনা-চিন্তা ফাঁসির দড়ির মতো জড়িয়ে থাকছে, ফলে জড়ত্বের প্রকোপ থেকেই যাচ্ছে। প্রথম দলের (৬১%) লোকেরা সবাই যে প্রাচীনপন্থী তা নয়, কিন্তু জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলিতে তারা ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছেন, নতুন মানবিক মূল্যবোধকে মুক্তকণ্ঠে গ্রহণ করতে পারছেন না নিজের বেলায়। এরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। দ্বিতীয় দল (২৭·৬%) তুলনামূলকভাবে কিছুটা সাহসী কিন্তু সামাজিক ভয়কে জয় করতে পারেননি। এই দুই দলের (৮৮·৬%) শতকরা হিসেব দেখলেই বোঝা যায় বাঙালীরা ব্যক্তিজীবনে প্রগতিশীল নয়। আপাত-দৃষ্টিতে কিছু প্রগতিশীল ভাবধারণা থাকলেও সামাজিক সম্পর্কস্তরে আমরা রক্ষণশীল।

এই সাথে আরেকটি দিক লক্ষ্যণীয়। যে ২৩৩টি বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করা হয়েছে এর মধ্যে ১১৮টি পাত্রপক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, ১১৫টি কন্যাপক্ষ থেকে। পাত্রীপক্ষ থেকে যে বিজ্ঞাপনগুলি দেওয়া হয়েছে সেখানে কি-ধরণের ছেলে

চাওয়া হয়েছে ? ডাক্তার/ইঞ্জিনীয়ার/সি-এ'কে চেয়েছেন শতকরা পনের জন, সাতাশ জন লিখেছেন সুপাত্র/উপযুক্ত পাত্র চাই, আর আটাশ জন জানাননি কি-ধরণের ছেলেকে চান। লক্ষ্য করুন, এই বিজ্ঞাপন-দাতাদের মনে হীনমন্যতা কিভাবে কাজ করছে। বিপরীত দিকে, যারা পাত্রী চেয়েছেন তাদের মধ্যে শতকরা সাতাশ জন চেয়েছেন শিক্ষিতা/সুন্দরী/ফর্সা, কুড়ি জন জানিয়েছেন যে পাত্রীর সুন্দরী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, চাকুরীরতা পাত্রীকে চেয়েছেন পনের শতাংশ, গৃহকর্মনিপুণাকে পাঁচজন এবং তিন শতাংশ বলেছেন উপযুক্ত পাত্রী চাই। যদিও বিজ্ঞাপনে "দাবী আছে" কথাটা কেউ লেখেননি (সম্ভবত আইনের ভয়ে) তবুও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে গৃহকর্মনিপুণার চেয়েও সুন্দরী পাত্রীর চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এর মধ্যে পাত্রপক্ষের আত্মশ্লাঘা যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি রুচির ব্যাপারেও খুব একটা উৎসাহ-জনক চিত্র মিলছে না।

পারিবারিকক্ষেত্র প্রসঙ্গে আমরা আগে যা আলোচনা করেছিলাম সে-কথার সাথে এই পরিসংখ্যানগুলি একই প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে। এই পটভূমিকায় পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার বিস্তৃতি ঘটানো যাক। সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈশ্য-মানসিকতার প্রসার বাড়ছে, পারিবারিক ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই যে Careerism-এর বীজ পোঁতা হচ্ছে, এর ফলে বাড়ছে ভোগবাদী, নব্য-ধনী মানসিকতা। এই বিশেষণটির দ্বারা এটা বলছি না যে পাত্রদের বাবারা গরীব ছিলেন কিংবা বংশে এরাই বেশি রোজগার করছেন ; যেটা বলতে চাই সেটা হল মানসিকতা। বনেদী-ধনীর মানসিকতা আর নব্য-ধনী মানসিকতার পার্থক্য আছে। নব্য-ধনীর মধ্যে এক ধরণের আহাম্মকী বা জাহির করার মানসিকতা থাকে। বনেদী-ধনীর মধ্যে যে-ধরণের আত্মসম্মানবোধ থাকে নব্য-ধনীর মধ্যে সেটি থাকে না। সমাজে যে বৈশ্য মানসিকতা ছড়াচ্ছে সেটি এই ধরণের নব্য-ধনী মানসিকতা। এবং পণ চাওয়ার পেছনে মনের এই বৃত্তিই কাজ করছে। এই নব্য-ধনী মানসিকতা তার উঞ্ছবৃত্তির জন্যই বিয়েতে পণ দাবী করে, সাংস্কৃতিক মান নিম্নস্তরের থাকায় এরা অসুস্থ মানসিকতার শিকার এবং এর ফলে নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। আইনের সাহায্যে এদের মানসিকতা বদলানো যায়নি, কারণ নিম্নস্তরের সাংস্কৃতিক মান এদের মনে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ঘটাতে পারেনি বলেই গণতান্ত্রিক আইনের প্রতি এদের আকর্ষণ নেই। শিক্ষিত হবার ফলে পণপ্রথা-

বিরোধী আইন বাঁচিয়ে এরা অন্যভাবে পণ দাবী করে। এদের এই মানসিকতা জোরালো হতে পারছে কন্যাপক্ষের দুর্বলতা তথা হীনমন্যতার জন্য।

এবারে এই সমস্যার দূরীকরণে কোন্ পথ নিতে হবে, এই আলোচনা আমরা করব স্বামীজীর চিন্তার আলোকে।

নারীত্বের আদর্শ

সমাজে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য স্বামীজী যে দু'টি বিষয়ের ওপর সবচেয়ে জোর দিয়েছিলেন তা হল—শিক্ষার প্রসার; এবং ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত করা।

বিবাহযোগ্যা মেয়েরা যে পণপ্রথাকে মেনে নিচ্ছে এবং এভাবে নৈতিক ও সামাজিক আইনভঙ্গকারী ছেলেদের বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে, এর মূলে আছে মেয়েদের আত্মসম্মানের অভাব। এর ফলেই তারা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব হারিয়েছে এবং অমানবিক প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। তরুণীদের চিন্তা করা দরকার, বিয়ে করে একটি পুরুষকে সেবা করা, তার ঘরদোর গুছিয়ে রাখা, তার বংশরক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং বিনিময়ে বছরে ৫-১০টি শাড়ি ও কিছু গয়না—এই কি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য? একথা কি কোনো স্ত্রী চিন্তা করছেন কিভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করছেন বা কিভাবে জীবনকে গড়ে তুলবেন? নিজের মনেই যদি স্বাধীনতার ইচ্ছা না থাকে, তবে কে স্বাধীনতা দেবে? যেন-তেন-প্রকারেণ একটা স্বামী জোগাড় করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? কাগজের "পাত্রী চাই" বিজ্ঞাপন পড়ার সময় দেখা যায় যে মেয়েদের বিদ্যা-বুদ্ধি-কর্মকুশলতার চেয়েও দৈহিক সৌন্দর্যের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে কি বার্ণার্ড শ'র কথাটিই ঠিক: Marriage is nothing but legalized Prostitution. জানি কথাগুলি খুব কড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এছাড়া এর ব্যাখ্যা কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "নিজহস্তে নির্দয় আঘাত" করে মানুষকে জাগরিত করার কথা। শুধু ছেলেদের ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই, মেয়েদের মনে কি স্বাধীন হবার ইচ্ছে ও সাহস আছে? একালের ঔপন্যাসিক শংকরের "নগরনন্দিনী" উপন্যাসে অনিমাদি পারমিতাকে বলেছিলেন, "আমাদের মা-দিদিমাদের স্বাধীন হবার ইচ্ছেই ছিলনা, আর আমাদের ইচ্ছে আছে কিন্তু সাহস নেই।"

ভারতে যুগ-যুগ ধরে সীতাকেই নারীত্বের আদর্শ বলে মনে করা হয়েছে।

স্বামীজী কিন্তু এই সাথেই সাবিত্রী ও দময়ন্তীকে যোগ করে বললেন, "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।" স্বামীজী কেন এই তিনজনের নাম করলেন ? প্রথমজন সীতা হলেন স্থৈর্যের প্রতীক। রাজকন্যা হয়েও তিনি যেভাবে বনবাসের দুঃখ সহ্য করেছিলেন, লঙ্কায় অশোকবনে তিনি যেভাবে মনের স্থিরতা বজায় রেখেছিলেন, এ-সবই তাঁকে করে তুলেছে স্থৈর্যের প্রতীক। আর সাবিত্রী অসম সাহসিকতার প্রতীক। মৃত্যুর সম্মুখীন হলেই বোঝা যায়, কে প্রকৃত সাহসী। সাবিত্রী যমরাজের মুখোমুখি হয়ে তাঁর সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই তিনি সাহসিকতার প্রতীক। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় বহু রাজা যেমন গিয়েছিলেন, তেমনি গিয়েছিলেন অনেক দেবতাও তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে। দময়ন্তী দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করে একজন মানুষের গলাতেই মালা দিয়েছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। তিনি তাই মানবতার প্রতীক। স্বামীজী সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর নাম উচ্চারণ করে স্থৈর্য-সাহস-মানবিকতার গুণগুলিকেই তুলে ধরেছেন।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নারীত্বের আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করে স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতে মাতৃভাবকেই আদর্শ মনে করা হয়। আর পাশ্চাত্যে রমনীভাবকে। তিনি বলেছিলেন, এই দুয়ের সম্মিলনেই আদর্শ নারী গঠিত হবে—ভারতীয় মায়ের মতো অনন্ত করুণা এবং পাশ্চাত্য নারীদের সাহস, এই দুই গুণের সমন্বয় চাই।

স্বামীজীকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন : ভারতীয় মেয়েদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বাণী ? উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন : ছেলেদের প্রতি আমি যে-কথা বলি, মেয়েদের উদ্দেশ্যেও সেই কথাই বলি। আর তা হল, সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়াও, ভারতে জন্মেছো বলে লজ্জাবোধ করোনা, নিজের শক্তি প্রকাশ করো। উক্তিটি লক্ষ্য করার মতো। আমরা আগেই দেখেছি, বর্তমানে মা-বাবারা ছেলে-মেয়েদের একইভাবে মানুষ করেন না। তারা ছেলেদের যতটা স্বাধীনতা দেন, ততটা স্বাধীনতা মেয়েদের দেন না, বরং বিয়ের দিকে তাকিয়েই মেয়েদের গড়ে তোলেন। স্বামীজী কিন্তু ছেলে-মেয়েদের একইভাবে মানুষ করতে বলেছেন। এবং এ-প্রসঙ্গে আরেকটি সাহসী মন্তব্য করেছেন তিনি। মা-বাবার পছন্দ-করা ছেলেকেই বিয়ে করতে হয়, এ-কথা বলে স্বামীজী দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন : উঃ, এ-দেশের মেয়েদের কি দুরবস্থা। পাশ্চাত্য

প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি যে এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন তা নয় (স্বয়ম্বর প্রথা প্রাচীন ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল) বরং তাঁর সমাজচেতনার মৌল ভিত্তি থেকে বিচার করেই তিনি এর সপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরী করুক। এতে যদি মানুষ ভুলও করে তবুও তিনি এর পক্ষপাতী। তিনি বলেছিলেন: অন্যের কথায় সায় দিয়ে ঠিক কাজ করার চেয়ে নিজের বুদ্ধিতে চলে ভুল করাও ভাল। যে দেশের মানুষ নিজের জীবনসাথী নির্বাচন করতে পারেনা, তারা নিজেদের সরকার নির্বাচন করবে কিভাবে?

তৎকালীন গোঁড়া সমাজনেতাদের ধিক্কার দিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন: নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এ-দেশের পুরুষেরা মেয়েদের সন্তান-উৎপাদন যন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে। তাই তিনি চেয়েছিলেন, মেয়েরা স্বাধীনভাবে গড়ে উঠুক। সে যুগে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের ওপর খুব জোর দিলেও স্বামীজী কিন্তু সমস্যাটিকে অন্যভাবে দেখেছিলেন। একবার কয়েকজন সমাজসংস্কারক যখন তাঁকে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: আমি কি বিধবা যে আমাকে এসব প্রশ্ন করতে এসেছেন? এটি মেয়েদের সমস্যা, এবং আমি চাই মেয়েরাই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক। এদেশের মেয়েদের দুর্দশার কারণ হল, তাদের সমস্যার সমাধান পুরুষেরাই তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ক'জন বিধবার বিয়ে হল তার ওপর একটা জাতির উন্নতি নির্ভর করেনা। যদি সত্যিই মেয়েদের উন্নতি করতে হয় তবে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যে-শিক্ষার ফলে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখবে, নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে এবং স্বাধীনভাবে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবে। সামান্য ক'টি কথায় স্বামীজী অপূর্বভাবে তুলে ধরলেন নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কথায় কথায় সমাজব্যবস্থাকে গালাগালি দিয়ে লাভ নেই। কবে সমাজ-ব্যবস্থা নিখুঁত হবে সেই আশায় বসে না থেকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্তরে এ-ধরণের শিক্ষার সাহায্যে আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ঘটানো দরকার।

জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথা

জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে স্বামীজীর কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা যাক প্রথমে।

"বর্ণ-বিশেষের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ অসার কল্পনামাত্র।"[৩]

"আমাদের বিভিন্ন বর্ণবিভাগ এবং নানা উপবিভাগের মধ্যে বর্তমান বিবাহপ্রথাকে সীমাবদ্ধ রাখা (যদিচ এ রীতি সর্বত্র পালিত হয় না) সত্ত্বেও আমরা পুরাপুরি মিশ্রিত জাতি।"[৪]

"...পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা... ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।"[৫]

উল্লিখিত তিনটি উক্তিতে স্বামীজী জাতিভেদ-প্রথাকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে খণ্ডন করেছেন। ব্রাহ্মণরা বৈদিক আর্যদের বংশধর, বাইরে থেকে ব্রাহ্মণদের এনে বাংলায় কৌলীন্য প্রথাকে প্রচলন করা হয়েছিল, ইত্যাদি মতবাদগুলি যে অসার কল্পনামাত্র স্বামীজীর এই কথাগুলি পরবর্তী-যুগে প্রমাণিত হয়েছে। রামপ্রসাদ চন্দ্র, নির্মল বসু প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ ইতিহাসবিদ, অতুল সুর প্রমুখ সংস্কৃতিবিদ—তাঁদের গবেষণায় স্বামীজীর উক্তিকেই সমর্থন করেছেন। রমেশবাবু, রাখালবাবু, নীহারবাবু দেখিয়েছেন যে কুলীন ব্রাহ্মণদের স্রষ্টা বল্লাল সেন নন, আদিশূর নামে কোন রাজাই ছিলেন না, কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে ঘটনাগুলি সব অতিকাহিনী, এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। অতুলবাবু প্রমাণ করেছেন বাঙালী ব্রাহ্মণ ও বাঙালী শূদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং বাঙালী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ব্রাহ্মণদের বংশধর নয়। যে কুলজীগ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণদের বংশবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে, রমেশবাবু সেগুলিকে জাল ও কাল্পনিক বলে আখ্যা দিয়েছেন, আর রাখালবাবু সেগুলিকে ইতিহাস বলেই মানেন নি। মনে রাখতে হবে, স্বামীজী এই গবেষকদের পূর্ববর্তী-কালের ব্যক্তি ছিলেন। এভাবে জাতিভেদ প্রথার তাত্ত্বিক ভিত্তি খণ্ডন করে স্বামীজী এর ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে বলেছেন: এটি ভারতের আকাশকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর এই উক্তি কতখানি সত্য তা যে-কোন সমাজ-সচেতন মানুষই অনুভব করবেন।

এই যে কল্পিত বর্ণপ্রথা, একে সত্য বলে মেনে নিয়ে বিবাহপ্রথা চালু থাকায় প্রকৃতপক্ষে কি হচ্ছে সে-সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, "আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ' বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হ'তে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল

হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও এসে জুটেছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরে চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। …শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।"[৬] স্বামীজীর এই উক্তি চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করে।

এই আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে স্বামীজী জাতিভেদ-প্রথাকে "অসার কল্পনা" বলেছেন এবং অসবর্ণ বিয়েকে শুধু সমর্থনই করেননি, এর আশু প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদ

বিচ্ছিন্নতাবাদ আজকের আর একটি প্রধান সমস্যা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদ যেন ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। পাঞ্জাবে শিখ-সমস্যা, আসামে ভাষা-দাঙ্গা, গোর্খাল্যাণ্ড-ঝাড়খণ্ড-উদয়াচল ইত্যাদি রাজ্যের জন্য দাবি, কাশ্মীরে সাংবিধানিক বিশেষ ব্যবস্থা, মহারাষ্ট্র-অন্ধ্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নাগাল্যাণ্ড-মিজোরামে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, এ-সব ঘটনা ভারতীয় ঐক্যে ক্রমাগত আঘাত হানছে। এগুলি বন্ধ করা না হলে দেশ অসংহত হয়ে উঠবে। শুধু অস্ত্রের জোরে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস কতটা সফল হবে? এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ আমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারে সে আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

উপরোক্ত ঘটনাগুলিকে অনেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আখ্যা দিয়ে, কেউবা শুধু অর্থনৈতিক কারণকেই এর জন্য দায়ী করছেন। পাঞ্জাব-সমস্যা আলোচনা করলেই দেখা যাবে, কেবল অর্থনীতি দিয়ে সমস্যার ব্যাখ্যা করলে অনুসন্ধান হবে নেহাৎই মামুলী। সংবিধানের রক্ষাকবচ এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবার ফলে আদিবাসী, উপজাতি, নিম্নবর্ণের ভারতীয়রা আগের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন। কাশ্মীর-নাগাল্যাণ্ড-মিজোরামে এটি স্পষ্ট। খালিস্থান, উদয়াচলের দাবি যারা করছেন তাদের কাছে বেকার সমস্যা, শিক্ষা না পাবার সমস্যা বড় কথা নয়। রাজনীতি বা অর্থনীতির দিক থেকে তারা শোষিত নন, বরং বাঙালী-মারাঠিদের চেয়ে তাদের অবস্থা ভাল।

তাহলে এদের আন্দোলনগুলির মূল দাবি কি? আন্দোলনগুলির মধ্যে দিয়ে কোন্ সামাজিক দাবি আত্মপ্রকাশ করছে?

ভারতবর্ষ বহুভাষী, বহুধর্মীয়, বহুগোষ্ঠীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ। বৃটিশ ভারতে এই বিভিন্ন শক্তির অনেকগুলিই চাপা ছিল। আত্মপ্রকাশের বিশেষ সুযোগ পায়নি শিক্ষার অভাবে। বিচ্ছিন্নভাবে এগুলি অবস্থান করত বলে পারস্পরিক আদান-প্রদান তথা communication-এর অভাবে ভারতীয়রা একটি মহাজাতি হিসেবে গড়ে উঠতে বাধা পেয়েছিল। তাছাড়া অসংখ্য দেশীয় রাজ্য ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও এই পার্থক্য বজায় রেখেছিল। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় শাসন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও পারস্পরিক মেলামেশা এই বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলির সমাজে পরিবর্তন নিয়ে এল। তারা দেখল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আর বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়, কারণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলি যেমন তাদের প্রভাবিত করছে, তেমনি অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন ঘটনাগুলিও এদের সমাজে ঢেউ তুলছে। ফলে ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক, এরা ভারতের মূল জীবন বা জীবন প্রবাহের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। এবং এখানেই দেখা দিল এদের সত্তার সমস্যা। বৃহৎ ভারত-সংস্কৃতিতে এরা কি নিজস্ব সত্তা বিলীন করে দেবে? বিপরীতপক্ষে যদি নিজস্ব সত্তা বজায় রাখতে হয় তবে তা কোন পথে সম্ভব? স্বামী বিবেকানন্দের মতে, Indian in content but regional in form—এই নীতিকে আশ্রয় করেই ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব।

যেহেতু ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে সাধারণ দেশবাসীর ধারণা পরিষ্কার নয় সেহেতু বৃহৎ ভারত-সংস্কৃতির মূল সুর কি, এটি তো তারা বুঝতেই পারছেন না, এমনকি নিজস্ব গোষ্ঠী-সংস্কৃতির বিকাশ কিভাবে হবে সে উত্তরও এরা জানেন না।

পাঞ্জাবে শিখরা ধর্মের মাধ্যমে নিজস্ব স্বকীয়তা খুঁজছেন, অসমীয়ারা খুঁজছেন ভাষার মাধ্যমে, সংস্কৃতি বা নিজস্ব জীবনযাত্রার মাধ্যমে এই স্বকীয়তা খুঁজছেন তামিলনাড়ুর লোকেরা, নাগাল্যাণ্ড-মিজোরাম-ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যে গোষ্ঠী-চেতনার মাধ্যমে নিজেদের বৈশিষ্ট্য খোঁজার প্রয়াস চলছে। এ-সমস্ত প্রয়াসের মাধ্যমে যে দাবির উপস্থাপনা দেখা যাচ্ছে তা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দাবির মুখোশ পরে হাজির হলেও মূল দাবিটি হল সাংস্কৃতিক।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে মহাজাতি গড়ে তোলার চেষ্টা আমেরিকা এবং রাশিয়াতেও দেখা গেছে। বৃটিশ-ফরাসী-ইহুদী-ডাচ্ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি সম্মিলিতভাবে মার্কিন সংস্কৃতি গড়ে তুললেও এটি বিশেষ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়নি। মার্কিন সংস্কৃতি মূলত Pop-culture-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীত দিকে রাশিয়াতে যে মহাজাতি গড়ে তোলা হয়েছে তাকে ত্বরান্বিত করেছে regimentation বা প্রশাসনিক জবরদস্তি ব্যবস্থা। ভারতের পরিস্থিতি কিন্তু রাশিয়া-আমেরিকার মতো নয়। Regimentation বা শিল্পায়নের চাপে নয়, ভারতে এই মহাজাতি গঠনের চেষ্টা চলছে ভিন্ন পথে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা code bill, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ, ক্লাসিকাল নাচ-গানের সাথে লোকশিল্পের সংরক্ষণ ও চর্চা—এসবের মাধ্যমে ভারতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারাকে রক্ষা করার প্রয়াস চলছে। এই মহাজাতি গঠনের প্রয়াস যে আজই শুরু হয়েছে তা নয়, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এই চেষ্টা চলেছে নতুন নতুন পথে। বৈদিক যুগে, মহাভারতের কালে, অশোক ও গুপ্ত সাম্রাজ্যে, নানক-কবীর-দাদূ-শ্রীচৈতন্য-রামমোহন-বিবেকানন্দের প্রয়াসে এই প্রয়াসেরই নানান দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। "শক-হূন দল পাঠান-মোগল একদেহে হল লীন"—বিশ্বকবির চেতনায়ও এ-দিকটিই ধরা পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটিই ভারতের সাধনা।

বর্তমানের শিল্পসভ্যতায় এই মহাজাতি গঠনের পথে বাধা কি এবং ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠী কিভাবেই বা এর সম্মুখীন হচ্ছে, এসবই ধরা পড়ছে নানান তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলির মাধ্যমে। এর সমাধান পেতে হলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কতগুলি প্রশ্নের অনুধ্যান বিশেষ জরুরী।

(১) ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ঐক্য-বৈচিত্র্যের সমাধানের চেষ্টা কিভাবে হয়েছিল?

(২) বর্তমানে কি কি নতুন বিষয় দেখা দিয়েছে?

(৩) বর্তমানে স্বকীয়তার ভিত্তি কি (একটি গোষ্ঠীর কাছে)?

(৪) এই ভিত্তি ও তার ব্যবহারিক রূপ কতটা মানবিক?

(৫) সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন বিষয়গুলির সাথে ওনং কথিত ভিত্তি কি-ধরণের সংঘর্ষে আসছে?

(৬) এই সংঘর্ষ ভারতীয় সংবিধানের মৌল ধারাগুলিকে কতখানি ব্যাহত করছে ?

(৭) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৩নং কথিত ভিত্তি ও তার ব্যবহারিক রূপের মধ্যে কতটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন—জাতীয় ঐক্য ও মানবিকতার খাতিরে ?

(৮) এই পরিবর্তন আনার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কি হবে ?

(৯) পরিবর্তনের পথে বাধাগুলি কি ?

স্বামীজীর মতে মানুষের দুটি সত্তা—ব্যক্তিক এবং সামাজিক। এই দুটির সংঘর্ষই সমাজের ও মানব-জীবনের মৌল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে গিয়েই মানবচেতনা বহুমাত্রিক পথে এগিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। অতএব শিখ সাম্প্রদায়িকতা, দ্রাবিড় মানসিকতা, মারাঠী ও বাঙালী প্রাদেশিকতা, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ইত্যাদি প্রসঙ্গকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না, এগুলিকে দেখতে হবে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে। ভাষাগত-শ্রেণীগত-ধর্মীয়-প্রাদেশিক সমস্যাগুলিকে স্বকীয়তা খোঁজার নানান প্রয়াস হিসেবে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাতে।

রাজনীতি এ-পথে খুব বেশি সাহায্য করবে না, কারণ বর্তমানের রাজনৈতিক দলগুলি এইসব ঘটনা ও পরিস্থিতিকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। আমাদের যেতে হবে আরও গভীরে। ভারতীয় জীবনের মূলসূত্র, গণমানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সাংস্কৃতিক প্রয়াসের নতুন দিগন্ত ইত্যাদির আলোচনার সাথে সাথে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কিভাবে জাতীর সমাজজীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে সে-সম্বন্ধে কিছুটা পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। এবং এ-প্রসঙ্গে বর্তমানের বস্তুগত অবস্থা বা Objective Situation-এর কয়েকটি দিক তুলে ধরা দরকার।

ভারতীয় ঐক্যে আঘাত হানছে গোষ্ঠীচেতনা যা প্রকাশিত হচ্ছে নানান রূপে—ধর্মের মাধ্যমে (পাঞ্জাব), ভাষার মাধ্যমে (আসাম), নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবে (ঝাড়খণ্ড) ইত্যাদি। রাজনীতিও একটি বড় বিচ্ছিন্নতাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এই যে ঐক্য-বিঘ্নকারী শক্তি যা কখনও সাম্প্রদায়িকতা, কখনও প্রাদেশিকতা, কখনও বা গোষ্ঠীতন্ত্রের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে সেটিতে

প্রধানত দুটি সমাজ জড়িত থাকে—সংখ্যাগরিষ্ঠ (majority) ও সংখ্যালঘু (minority)। Majority বলতে অবশ্য শুধু সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীকে বোঝান হচ্ছে না কারণ সংখ্যায় কম হয়েও একটি গোষ্ঠী প্রধান হয়ে উঠতে পারে (effective majority)। উদাহরণ হিসেবে আসামের কথা বলা যায়। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠন করার সময় প্রকৃত অসমীয়াদের সংখ্যা ছিল আসামের মোট জনসংখ্যার ৩০%। এজন্য এই আলোচনায় আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে বোঝাচ্ছি প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে উল্লেখ করেছি তাদেরই যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বহির্ভূত স্বকীয় সত্তার অধিকারী। এবং প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতা-বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদিকে সংঘাতময় পরিস্থিতি হিসেবে ধরছি। এই সাথেই মনে রাখতে হবে যে ধর্ম-ভাষা-শ্রেণী ইত্যাদি নিয়ে ভারত একটি বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের সমাজ। শুধুমাত্র আইন দিয়ে (অর্থাৎ রাষ্ট্র শক্তির মাধ্যমে) ঐক্য আনার চেষ্টা প্রাচীন ও মধ্যযুগে হয়েছে কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেন ও কিভাবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ—সংখ্যালঘিষ্ঠ সংঘাত ভয়ংকর হয়ে উঠছে সে-কথা আলোচনা করে আমরা সমাধানের পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হব।

আত্মসত্তার সন্ধান

সংঘাতময় সমস্যায় আত্মসত্তা রক্ষার প্রয়াস বড় ভূমিকা নেয়। যখন সংখ্যালঘিষ্ঠ স্বকীয় সত্তা প্রকাশ করতে চায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ এই প্রয়াসকে মনে করে সমাজ-জীবনের মূল স্রোত (mainstream) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়াস, তখনই সংঘাতের উদ্ভব হয়। দুই দলই যখন এভাবে নিজেদের মানসিকভাবে অ-নিরাপদ (psychologically insecure) মনে করে তখন পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধু এক গোষ্ঠীর মধ্যে এই মানসিকতা দেখা গেলে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কথা ভাবা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে শিখরা নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষায় উদগ্রীব কিন্তু তাদের এই প্রয়াসে (প্যাণ্ডেল বেঁধে-গণ-অবস্থান, ধর্মঘট।) বাঙালীরা অনিরাপত্তা বোধ করেনি। ফলে এটি সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ হলেও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠেনি। বিপরীত দিকে আসামে অসমীয়া (majority) ও বাঙালী (minority) উভয় সম্প্রদায়ই অনিরাপদ বোধ করায় অবস্থা উদ্বেগজনক।

এই যে স্বকীয়তাবোধ (identity) এটি মানুষের মনে শিশুকাল থেকেই জাগে এবং সাত বছরের মধ্যেই এটি রূপ ধারণ করে। শিশু তার বাড়িতে যে চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হয়, বাইরে কারোর মধ্যে তার বিপরীত কিছু দেখলেই সে সচেতন হয়ে ওঠে। প্রথমত ভাষা ও চেহারার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য শিশু আবিষ্কার করে। অবশ্য সাথে সাথেই এ বিষয়ে সংস্কারবোধ জাগে না, যদি মা বাবা অন্তদের প্রতি বিরোধী মনোভাব না রাখেন কিংবা ইস্কুলে তাকে এ বিষয়টি শেখান না হয় (কোন কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীচের ক্লাসেই ধর্মশিক্ষা দেবার সময় ঐ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হয় এবং এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিরোধিতার বীজ বপন করা হয়)।

শিশু পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (+ খেলার সাথী) থেকেই এই স্বকীয়তা বা গোষ্ঠী-বৈশিষ্ট্য বুঝতে শেখে। আর একটু বড় হয়ে সে সমাজে তার স্থিতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ সমাজে তার স্থান কি ও ভূমিকা কতখানি। এই প্রশ্নের উত্তরে সে দুটি দিক আবিষ্কার করে—কাদের সাথে তার মিল ও কাদের সাথে অমিল রয়েছে, এবং এই মিল-অমিল কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হচ্ছে। যাদের সাথে তার মিল রয়েছে তাদের সাথে সে একাত্মবোধ করে—যা জন্ম দেয় গোষ্ঠীচেতনার এবং যার ভিত্তিতে (অর্থাৎ ধর্ম-শ্রেণী-ভাষা ইত্যাদি) এই মিল-অমিল সে আবিষ্কার করে তার ওপর নির্ভর করে তার গোষ্ঠীচেতনা বেড়ে ওঠে।

এই গোষ্ঠীচেতনা উগ্র হয়ে পড়ে যদি তার মনে আত্মশ্লাঘা বা হীনমন্যতা বোধ সক্রিয় থাকে। তখন তার মানসিকতায় ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। প্রথমত, সে ভবিষ্যতের পরিণতির কথা না ভেবে সাময়িক ও তাৎক্ষণিক লাভের জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, বিরোধী মতকে সে সহ্য করতে পারে না। তৃতীয়ত, শক্তিপ্রয়োগের ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। চতুর্থত, নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা চায়। পঞ্চমত, প্রচলিত বিধি সে মেনে চলে এবং পরিবর্তনকে পছন্দ করে না। ষষ্ঠত, তার কাছে জগৎটা বিশৃঙ্খলা ও বিপদে ভর্তি।[৭] অর্থাৎ সে তার গোষ্ঠীচেতনায় নিজের সত্তাকে খুঁজে পায় এবং সেজন্ত এই গোষ্ঠীচেতনাকে ছাড়তে বা বদলাতে চায় না।

গোষ্ঠীচেতনার প্রতিক্রিয়া

সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যখনই সমাজে তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অনুভব করে তখনই বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং তাদের চেতনা অনিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। তখনই সেই গোষ্ঠীর লোকেরা সম্মিলিতভাবে এই বৈষম্য ও বিরোধিতার (এদুটি বাস্তব বা কাল্পনিকও হতে পারে) মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় তারা নিজেদের গোষ্ঠীর লোক, ধনসম্পত্তি বা জমির জন্য লড়াই করছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে তাদের সংগ্রাম নিজস্ব গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখার। এবং মানুষ-সম্পত্তি-জমির চেয়ে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা ধারা রক্ষায় তারা বেশি অগ্রণী হয়। পাঞ্জাব-ঝাড়খণ্ড-তামিলনাড়ু-আসাম ইত্যাদির দিকে তাকালে বিষয়টি বোঝা যাবে।

বিপরীতদিকে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া হয় তার প্রভাব কমে গেলে বা কমার ভয় থাকলে। এই প্রভাব জনসংখ্যার দিক থেকেও হতে পারে (তামিলনাড়ুতে হরিজনদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া), আবার শিক্ষা-পদ-সম্পত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হতে পারে (মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, আসামে আসু, মেঘালয়ে খাসিয়াদের দাবি সংরক্ষিত রাজ্যের জন্য)। সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী সবার জন্য এমন আইন চায় যে আইনে তাদের প্রভাব থাকবে। এবং তাদের মূলপ্রবাহের (mainstream) দাবি আসলে নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে সবার অন্তর্ভুক্তির দাবি। সংখ্যাগুরু জোর দেয় ঐক্যের ওপর, আর সংখ্যালঘু জোর দেয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ওপর। সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর ভয় প্রধানত চারটি। প্রথমত সংখ্যালঘুগোষ্ঠী জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে (মুসলমানদের প্রতি গোঁড়া হিন্দুদের মনোভাব) দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব হাত-ছাড়া হতে পারে (মেঘালয়ে বাঙালীদের প্রতি গারো-খাসিয়ার মনোভাব)। তৃতীয়ত, সমাজ-কাঠামো বদলে যেতে পারে (শ্রীলঙ্কার তামিলদের প্রতি সিংহলীদের মনোভাব)। চতুর্থত, সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে (আসামে বাঙালীদের প্রতি অসমীয়া-মনোভাব)।

জাতীয় নেতৃত্ব ও আইন থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু পারস্পরিক অবিশ্বাস কমে না কেন ? প্রথমত, জাতীয় নেতৃত্বের ওপর অনাস্থা থাকায় এরা গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের আশ্রয় নেয় এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামগ্রিক সমাধান চায়। দ্বিতীয়ত, দুই দলই মনে করে আইনের সুযোগ নিয়ে অন্য দল এগিয়ে যাচ্ছে।

অতীত ও বর্তমান

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর দ্বন্দ্ব বেশি প্রকাশ পাচ্ছে ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার রূপে। অতীত ও বর্তমানকালের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মধ্যযুগে, এমন কি ইংরেজ আসার প্রথমদিকেও, হিন্দু রাজা ও মুসলমান নবাবের মধ্যে বহু যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সে-সব যুদ্ধ হিন্দু-মুসলমানদের যুদ্ধ বলে কেউ মনে করত না। মুঘল-বংশ মুসলমান হলেও উঁচু পদগুলিতে হিন্দুদেরই আধিক্য ছিল। সিরাজদৌল্লার রাজ্যরক্ষায় মোহনলাল প্রাণ দিয়েছিলেন আর মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে সাম্রাজ্যে ধ্বস নামায় যে দুটি রাজ্য তার একটি বিজয়নগর (হিন্দু রাজা), অপরটি বাহমনী (মুসলমান)। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মারাঠা রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের পরাজিত করে, দিল্লীর সিংহাসনে মহম্মদ শাহকে বসিয়েছিলেন পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ, দ্বিতীয় আলমগীরকেও সিংহাসনে বসায় মারাঠারা। বস্তুত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে তখনকার মুসলমান রাজারা যেমন হিন্দু-মুসলমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, হিন্দু রাজারাও তাই। ধর্মীয় ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বা আপোষের উদাহরণ তেমন দেখা যায় না। এই সাথেই আরেকটি দিক লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় ইতিহাসে মগধের সম্রাট যুদ্ধ করেছেন গৌড়ের রাজার সাথে, কিন্তু তা বিহারী বনাম বাঙালীর যুদ্ধ ছিল না। পল্লব রাজার সাথে চালুক্য রাজার যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু সেটি তামিল বনাম অন্ধ্রবাসীদের লড়াই ছিল না। অর্থাৎ এই যুদ্ধগুলির ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা ছিল না। বর্তমান ভারতে এই দুটির যে রূপ দেখা যায় তার চরিত্র আলাদা। বর্তমানের সংঘর্ষগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো—সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ, এর উপাদানগুলি, এবং সংগঠন। সাম্প্রদায়িক শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি, শুধু ধর্মীয় অর্থে নয়। মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ গড়ে ওঠেনি। বর্তমানের সংঘর্ষগুলিতে অতীতের কিছু উপাদান ব্যবহার করা হলেও এর লক্ষ্য বর্তমান কাল ও সমাজ এবং নতুন মতাদর্শ—যার প্রসারে নতুন ধরনের সংগঠন তৈরী হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে দুটি প্রধান দিক থাকে—অন্য গোষ্ঠী সম্পর্কে ভীতির প্রচার এবং নিজেদের গৌরব অনুধ্যান। এই দুটি বিষয় একসাথে না থাকলে একটি সংগঠন সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি

তাদের মতাদর্শে এই দুটি দিককে একসাথে তুলে ধরে এবং এর ভিত্তিতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকেরা ধর্মরক্ষার নামে আহ্বান জানায়। প্রাদেশিকতা-দুষ্ট সংগঠন মাতৃভূমি রক্ষার নামে আহ্বান জানায়। ইংরেজিতে নেশন, রেস, রিলিজিয়ন, ক্লাস ইত্যাদি শব্দগুলিকে ভারতীয় ভাষায় শুধু "জাতি" হিসেবে তুলে ধরাটা অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি এটিই করে। এবং ঐভাবে একটি জাতিগত অতিকাহিনী (racial myth) তৈরী করে গোষ্ঠীচেতনার। চারটি প্রধান পথে এই অতিকাহিনী নির্ভর গোষ্ঠীচেতনাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার চেষ্টা হয়। প্রথমত, এই অতিকাহিনীকে যুক্তি দিয়ে গোষ্ঠীচেতনায় দৃঢ় করে। দ্বিতীয়ত, এই মিথের মাধ্যমে কিছু মূল্যবোধ তৈরী করে। তৃতীয়ত, এই চেতনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাকে সামাজিক ও ঐতিহ্য বিরোধিতা হিসেবে জনমানসের কাছে তুলে ধরে। চতুর্থতঃ, এই চেতনার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী শুরু করে।

রাষ্ট্র যদি উদার গণতান্ত্রিক হয় তবে সংকীর্ণ অর্থ নৈতিক স্বার্থে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখা দিতে পারে, আবার রাষ্ট্র যদি উগ্র জাতীয়তাবাদী হয় এবং গণতান্ত্রিক উপাদান কম থাকে তাহলেও এ-ধরণের আন্দোলন দেখা দিতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নেতারা স্বীয় স্বার্থের জন্য মানুষকে কাজে লাগায়। এ-ধরণের ক্রিয়াকলাপ দেশের ঐক্য তো নষ্ট করেই, এমন কি ঐ গোষ্ঠীর উন্নতিও ঘটায় না। ভারতের আদিবাসী-উপজাতি মানুষের অবস্থা বিশেষ বদলায় নি, কিন্তু একশ্রেণীর নেতা-গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে যারা নব্য-ধনী। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিতে এই নব্য-ধনী বাবু সম্প্রদায়ের স্বরূপ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ না করে জাতীয় দলগুলি বরং তাদের বাঁচিয়ে রাখছে স্বীয় স্বার্থেই। এইসব আঞ্চলিক নব্য-বাবু ও জাতীয় নেতাদের পারস্পরিক সমঝোতা বিচ্ছিন্নতাবাদকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে।

বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে জাতীয় সংহতি

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, স্বামীজী ভারতের জাতীয় সংহতি চেয়েছিলেন বিশ্ব-সভ্যতার দিকে তাকিয়ে। তাঁর মতে, এখন পর্যন্ত প্রকৃত সভ্যতার আরম্ভ হয়নি। মানবজাতি এই সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে যা তৈরী হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শের মিলনে এবং ভারত এতে

বিশেষ অবদান রাখবে। পাশ্চাত্য জোর দিয়েছে বিশ্লেষণে (analysis), প্রাচ্য সমন্বয়ে (synthesis)। পাশ্চাত্য বহির্জগৎ (external nature) জয়ের পথ দেখিয়েছে এবং প্রাচ্য দেখিয়েছে অন্তর্জগৎ (mind) জয়ের পথ। ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতা গড়ে উঠবে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ জয়ের মাধ্যমে। এই বিশ্বসভ্যতা গঠনে অবদান রাখার জন্য ভারতকে পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হবে এবং এজন্যই প্রথমে দরকার নিজের ঘর গোছান বা জাতীয় সংহতি।

এই জাতীয় সংহতি ভারতীয়দের গড়ে তুলতে হবে নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে, ভারতাত্মার মর্মবাণীকে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে। ইতিহাস বারবার যেমন "শক-হুন দল পাঠান-মোগল"কে "এক দেহে লীন" করেছে, সমন্বয়ের সেই উদাহরণ আরেকবার দেখাতে হবে ভারতকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। স্বামীজী এদিকে তাকিয়েই ভারতকে এক অখণ্ড জাতি হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। নানান ধর্ম-ভাষা-শ্রেণীর সমন্বয়েই এটি সম্ভব। জাতীয় সংহতির পথে যে সব বাধা দেখা যাচ্ছে—যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম—সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ-বাণী কিভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলে সেটাই আলোচ্য বিষয়।

এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তৃতা ও লেখায় আমরা চারটি প্রধান কর্মসূচী পাই।

(১) মতাদর্শগত সংগ্রাম
(২) ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন
(৩) সামাজিক বৈষম্য দূর
(৪) নতুন জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি।

মতাদর্শগত সংগ্রাম

আমরা আগেই দেখেছি, বিচ্ছিন্নতাবাদের একটি মতাদর্শ (communal ideology) থাকে। এটি ব্যবহার করে গণচেতনায় সঞ্চার করা হয় সংগঠনের মাধ্যমে। বরং এও দেখেছি যে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিরোধ-সমস্যার শুরু। ভারতে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্বের প্রবক্তা এটি। এই যে racial myth, একেই স্বামীজী আক্রমণ করছেন মতাদর্শগত সংগ্রামে। "আমরা পুরাপুরি মিশ্রিত জাতি" এই কথা বলে তিনি racial myth-কে "দৃঢ় সমালোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ" করে নিতে বলেছেন। বর্ণপ্রথাকে ও আর্যদ্রাবিড় ধারণাকে

তীব্র আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন, "আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি ; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত, এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত ; মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাহাদের জন্য আমরা গর্বিত।"[৮] প্রকৃত নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে স্বামীজী তুলে ধরলেন যে অতীতের বিভিন্ন জাতি মিশে গিয়ে বর্তমান ভারতীয়দের সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং কোনও বিশেষ গোষ্ঠী নিজেদের বিশুদ্ধতা দাবি করতে পারে না। ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কেউই আলাদা নয়, একই রক্ত বইছে সবার ভেতর, যেমন গুজরাটি-অসমীয়া-তামিল ভাষাভাষীদের মধ্যে। আলাদা ধর্ম ও ভাষা থাকলেও এরা নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে একই জাতিতে পরিণত।

আসলে স্বামীজী যার ওপর জোর দিয়েছিলেন সেটি হল ভারত-চেতনা। যথার্থ ভারতীয় ইতিহাস-বোধই এটি জাগাতে পারে। ভারতের মুসলমানেরা শুধু আরবীয় ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে ভুল করবে। খৃষ্টানদের পক্ষেও ভুল হবে ইতালি ও আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকা, হিন্দুরাও তেমনি ভুল করবে যদি তারা লোক-সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু বৈদিক সংস্কৃতিকেই ভারতীয় সংস্কৃতি বলে মনে করে। যুগে-যুগে যে নানান সংস্কৃতির ধারার সমন্বয় ঘটেছে এবং সেই সমন্বয় বর্তমানে যে রূপ ধারণ করেছে, এগুলিকে এড়িয়ে গেলে ভারত-বোধ আসবে না। সেই সাথেই ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে নব্য-বুদ্ধিজীবীরা যে পাশ্চাত্য চিন্তার আমদানী করছেন, সেগুলিকে কঠোরভাবে বিচার করে প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরতে হবে। ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসবাদী এবং অ-মার্কসবাদী পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা বহু ক্ষেত্রেই ভুল করেছেন। তারা এশিয়াটিক মোড অব্ প্রোডাকশনে স্থবিরতা দেখেছেন, ভারতের মধ্যযুগকে "অন্ধকারময়" বলেছেন (অথচ এই মধ্যযুগেই তুকারাম-নানক-কবীর-তুলসীদাস-চৈতন্য প্রমুখের চেষ্টায় আঞ্চলিক ভাষা-গুলিতে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি সংগঠিত হতে পেরেছে)। এসব বিদেশী প্রবক্তারা ভারতীয় প্রাণসত্তা (ethos) ধরার চেষ্টা করেন নি।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাণসত্তা উপলব্ধি করার সাথে সাথে দেখতে হবে কি'ভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে, দেখতে হবে ভারতীয়রা কখন ভুল করেছে, কখনই বা সফল হয়েছে। ভারতীয় সমাজে

সংযোজন ও বিস্তারের ফলে জাতির আয়তন বেড়েছে, আর এভাবেই জাতি বহুভাগে ভাগ হয়ে গেছে এবং বিদেশীদের কাছে পরাস্ত হয়েছে। "ভারতে বিবেকানন্দ" বইয়ে এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর বিভিন্ন মন্তব্য ও ব্যাপক বিশ্লেষণ রয়েছে। তিনি বারবারই ইতিহাস থেকে দেখিয়েছেন যে বর্জনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ কিভাবে দেশের ক্ষতি করেছে এবং বৈচিত্র্যকে রক্ষা করেই যথার্থ ঐক্য গড়ে উঠেছে।

এভাবে প্রকৃত ইতিহাস-চেতনার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবোধের উদ্বোধন চেয়েছেন এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন বারবার—যে দেশের উন্নতি বলতে সব অঞ্চলের উন্নতি বোঝায়। অন্য গোষ্ঠীগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল নিজেদের গোষ্ঠীর উন্নতি যারা চায় তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। ইতিহাসের কথা তুলে বলেছেন, "...যে-গোষ্ঠীটি নিজেদের উন্নীত করিয়াছে, তাহারা নিজেদের জন্য সব সুবিধা সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে চায়। সুতরাং উচ্চ-বর্ণেরা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা—যখনই সম্ভব হইয়াছে, রাজার সাহায্যে এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্রের দ্বারাও নিম্নবর্ণের লোকদের উচ্চাশা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাহারা কি সফল হইয়াছিল? নিজেদের পুরাণ ও উপপুরাণগুলি যত্নসহকারে লক্ষ্য কর—বিশেষতঃ বৃহৎ পুরাণগুলির স্থানীয় স্থানীয় সংস্করণগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; দৃষ্টির সম্মুখে ও চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে ভাল করিয়া লক্ষ্য কর—উত্তর পাইবে।"[৯] অর্থাৎ স্বামীজী চাননি যে শুধু ভাবাবেগের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠুক। শুধু ভাবাবেগের ওপর জোর দিয়ে মিথ্যা চেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও সংগঠনগুলি। স্বামীজী চেয়েছিলেন যুক্তির মাধ্যমে, প্রকৃত ইতিহাস-চেতনার আশ্রয়ে এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভারতীয়রা জাতীয় সংহতির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। এজন্যই তিনি উন্নত জাতিগুলিকে যেমন সতর্ক করেছেন, সেরকম আবার বলেছেন, "অব্রাহ্মণেরাও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ঘৃণাসৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছেন—মূল সমস্যা-সমাধানের পক্ষে এ ধরণের কাজ নিতান্ত বিঘ্নস্বরূপ। অহিন্দুরাও এই পারস্পরিক ঘৃণার বিস্তারে সহায়তা করিতেছেন মাত্র।"[১০] বর্তমান ভারতের তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনৈতিকনেতাদের সাথে স্বামীজীর এখানেই পার্থক্য। বর্তমানের রাজনৈতিক নেতারা ভোট পাবার জন্য এবং প্রকৃত শিক্ষা ও চরিত্রগত উৎকর্ষতার অভাবে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রকাশ্যে ও

গোপনে সহায়তা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত বিজ্ঞানচেতনা নিয়ে স্পষ্ট উক্তির সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে অনৈক্যের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠরা যেমন দায়ী, তেমনি সংখ্যালঘুরাও দায়ী। আজ ভারতের দিকে তাকালে এটি বোঝা যায়। অহিন্দু নেতারা ভুলে যান যে তাদের কাজের দ্বারা যদি হিন্দুদের স্বাভাবিক উদারতা নষ্ট হয় তবে মুসলমান-খৃষ্টানদের পক্ষে এ-দেশে থাকাই মুস্কিল হবে। ধনী ও মধ্যবিত্তেরা ভুলে যান এ দেশে দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলে তাদের ওপর দরিদ্রদের আক্রমণ শুরু হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই সমগ্র জাতির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি চেয়েছেন। মানুষের শরীরের অংশগুলি যেমন পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রেখে বেড়ে ওঠে এবং শুধু একটি অংশের বেড়ে যাওয়া ক্যান্সারের লক্ষণ যা মৃত্যু ডেকে আনে, সমাজের পক্ষেও সেই একই কথা।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভিত্তি

স্বামীজী জাতীয় ঐক্য চেয়েছেন বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেই, কারণ তিনি জানতেন Regimentation-এর সাহায্যে ঐক্য স্থাপিত হয় না। এজন্য তাঁর সংহতিসূত্র হল, "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" এই নীতির ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক সমন্বয়। আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তিনি চাননি, বরং এগুলির অ-মানবিক দিকগুলি বাদ দিয়ে প্রাণোচ্ছল দিকগুলিকে রক্ষা করে এগুলি যাতে মানুষকে ভারত-বোধে উদ্দীপ্ত করতে পারে, এভাবে তিনি এর উদ্বোধন চেয়েছেন। তাঁর মতে, আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলি হবে রূপে আঞ্চলিক কিন্তু মূলসত্তায় ভারতীয় (Indian in content but regional in form)। সঠিক-পথে অগ্রসর হলে আঞ্চলিকতাও জাতীয় উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মনেতারা ধর্মীয় সংস্কারের যে আন্দোলন করেছিলেন, তা না হলে হিন্দু-প্রধান ভারত আজ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে পারত না।

স্বামীজী বৈচিত্র্যের মধ্যে সাধারণ উপাদান (common element) খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ভাষাগত বিভিন্নতার কথাই ধরা যাক। ভারতের অধিকাংশ ভাষারই উৎস সংস্কৃত (এমন-কি তামিল ভাষাতেও সংস্কৃতের প্রভাব যথেষ্ট) বলে উৎসের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে ভাষা নিয়ে বিভেদের প্রশ্ন ওঠে না। কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃতের ওপর জোর দিলে মুসলমানেরা সন্দেহগ্রস্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, উর্দু ভাষার ওপরও কি

সংস্কৃতের প্রভাব নেই ? হিন্দীকে বাদ দিয়ে উর্দু দাঁড়াতেও পারে না, আর হিন্দী তো সংস্কৃত থেকেই এসেছে। সংস্কৃতই যদি অধিকাংশ ভাষার উৎস হয়, তবে একটি ভাষা উন্নত অন্য ভাষা অনুন্নত—এর জন্য দায়ী কে ? দায়ী ঐ ভাষার লোকেরা। বাংলা ভাষার উন্নতি বাঙালীদেরই দ্বারাই হয়েছে, মারাঠী ভাষার উন্নতি করেছে মারাঠীরাই। অতএব কোন ভাষা যদি অনুন্নত হয় তবে তার জন্য ঐ ভাষার লোকেরাই দায়ী, অন্য কেউ নয়।

এই সাথেই মনে রাখা দরকার সংবিধান ১৫টি ভাষাকে স্বীকৃতি দিলেও ভারতে আরও ২৮১টি কথ্য ভাষা (dialect) আছে। ঐ সংখ্যালঘু ভাষা-ভাষীদের অগ্রাহ্য করার কোন অর্থ হয় না। ভাষা-সাম্প্রদায়িকদের মনে রাখা উচিত যে শুধু জনসংখ্যার দ্বারা একটি ভাষার উন্নতির পরিমাপ করা যায় না, একটি ভাষা উন্নত কি-না তা নির্ভর করে সেই ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষা ভাষীদের কতখানি আকর্ষণ করতে পেরেছে, তার ওপর।

ধর্মের ক্ষেত্রেও স্বামীজী একই কথা বলেছেন। বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে তিনি পাঁচটি নীতিকে তুলে ধরেছেন—[১] সত্য এক, বিভিন্ন-রূপে তাঁর প্রকাশ [২] মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি রয়েছে বলে আত্মশক্তির উদ্বোধনের ওপর জোর দিতে হবে, [৩] মানুষই তার ভাল-মন্দের জন্য দায়ী, [৪] মানুষের উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—প্রাকৃতিক শক্তি, অশুভ সমাজব্যবস্থা ও নিজের মানসিক কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি, [৫] বিশ্বমানবের সাথে ঐক্য উপলব্ধি করা। এগুলি ভারতীয় ধর্ম-ঐতিহ্যের অনুসারী, প্রকৃত ধর্মের প্রকাশক, এবং এই নীতিগুলিকে মানতে নাস্তিকদেরও আপত্তি থাকার কথা নয়। এই নীতিগুলির ভিত্তিতেই বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরের কাছে আসতে পারে।

তবে বাধাও আছে। নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানকে বদলে নিতে কেউ কেউ দ্বিধাবোধ করেন। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য, আচারের মূল তত্ত্বটি বোঝা দরকার, জানা দরকার যে অনেক ধর্মীয় আচার তৈরী হয়েছিল অতীতে সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যে-প্রয়োজন হয়ত এখন আর নেই, অতএব মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় আচার ত্যাগ করতে হবে। তিনি স্পষ্টই বলছেন, ধর্মের মুখ্য ও গৌণ অংশের পার্থক্য বুঝতে হবে, প্রকৃত ধর্ম চাই, দেশাচার-লোকাচার-সর্বস্ব ধর্ম নয়। প্রকৃত ধর্মকে ভুলে আচারকে বড় করে দেখলেই আসে মৌলবাদের (fundamentalism) গোঁড়ামী। অবশ্য স্বামীজী এ-বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন যে এ-কথায় পুরোহিতরা (পাদ্রী-

পুরোহিত-মৌলবী) রাজী হবে না, কারণ এই আচার-অনুষ্ঠানের ওপরই তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে আছে। স্বামীজী তাই আহ্বান জানিয়েছেন প্রকৃত ধর্মপ্রেমিকদের, সতর্ক করে দিয়েছেন—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় ধর্মকে উদ্ভাসিত না করে তুললে ধর্ম তার প্রাণশক্তি হারাবে। তিনি ধর্মে গণতন্ত্রের আহ্বান জানিয়েছেন, বলেছেন বস্তুগত (Objective) দৃষ্টিভঙ্গি আনার কথা। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেমন "যত মত তত পথ"-এর প্রবক্তা, তেমনি ধর্মকে ব্যবহারিক করে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা রেখেও মানুষকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন নিজের নিজের ধর্মকে বিচার করতে। শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ না ধরে তার ভাবার্থ বোঝা এবং পুরোহিত ও ধর্ম-নেতাদের কথা বিচার করে গ্রহণ করা—এই দুটির ওপর জোর দিয়ে তিনি মানুষকে ডাক দিয়েছেন নিজের নিজের ধর্মকে উন্নত করে তুলতে। ভয় বা প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে ধর্ম গ্রহণ করাকে তিনি ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, জিজ্ঞাসা ছাড়া মানুষের প্রগতি সম্ভব নয়।

এইসাথেই তিনি বলেছেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানের কথা। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ, খৃষ্টানদের সাংগঠনিক দক্ষতা (organising capacity), বৌদ্ধ করুণা, হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা ও দার্শনিক চিন্তা—বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয় চেয়েছেন তিনি। বলেছেন প্রতিটি ধর্মই অন্য ধর্মগুলির ভালদিকসমূহকে আত্মস্থ করুক, অন্য জাতির কাছ থেকে সদ্‌ভাবাত্মক দিকগুলি শিখুক। ধর্মকে স্বামীজী কখনই a closed circle of fixed doctrines and dogmas বলে দেখতে রাজি ছিলেন না, বরং তিনি চেয়েছেন open search for truth হিসেবে ধর্মগুলি গড়ে উঠুক। সমগ্র মানবজাতির একাত্মবোধ এবং মানুষের অসীম শক্তির কথা ঘোষণা করেই ধর্মগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে। স্বামীজীর এই কথাগুলির দিকে নজর না দিলে ধর্মগুলি সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়বে এবং ধীরে মানুষের কাছে তার আকর্ষণ হারাবে। এজন্য তিনি ধর্ম ব্যাপারটিতে মন্দির-গীর্জা-মসজিদ কর্তৃত্বের আধিপত্য চাননি। তিনি ধর্ম-প্রাণ সাধারণ মানুষদের বলেছেন সবাই মিলে সাধনা ও objective দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নিজের নিজের ধর্মগুলিকে আরও উন্নত করে তুলুক, যাতে ধর্মগুলি সার্বজনীন হয়ে ওঠে অর্থাৎ সবরকম মানুষকে যেন খোরাক দিতে পারে।

সামাজিক বৈষম্য দূর

জাতীয় সংহতির জন্য স্বামীজী শুধু মতাদর্শগত সংগ্রামই চান নি, সেইসাথে সামাজিক বৈষম্য দূর করার ওপরও জোর দিয়েছেন। জাতীয় সংহতির বিঘ্নকারী শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িক ভাবধারা প্রচার ক'রে নানা সামাজিক বৈষম্যকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। স্বামীজী বলেছেন, জাতীয় সংহতির পথে মানুষের সম-অধিকার একটি মস্ত বড় বিষয়। মতাদর্শের মত সমাজ-কাঠামো এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনতে হয়। এই সম-অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি অনুন্নত গোষ্ঠীর কথা ভুলে যাননি এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। অনুন্নত গোষ্ঠী বলতে তিনি মূলত খেটে-খাওয়া মানুষের সাথে নারীদেরও ধরেছেন।

উন্নত গোষ্ঠীগুলি নিজেদের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ চায় সেগুলি পরিত্যাগ করে তারা অনুন্নত গোষ্ঠীগুলিকে উন্নত করতে এগিয়ে আসুক এই কথা বলে স্বামীজী অনুন্নত গোষ্ঠীগুলিকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন, "ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনও কিছু পায় নাই। আমরা যাহা পাইবার যোগ্য তাহাই লাভ করিয়া থাকি।"[১১] এযুগের নেতাদের মতো স্বামীজী একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে বাস্তব যুক্তি দিয়ে অনুন্নত গোষ্ঠীগুলিকে সচেতন করতে চাইলেন। স্পষ্টভাবেই বললেন, "তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ"।[১২] বর্তমানের তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা যদি স্বামীজীর এই কথাগুলি মনে না রাখেন তাহলে তারাও নব্য-ব্রাহ্মণে পরিণত হবেন। এবং পরিণামে তারাও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবেন। স্বামীজীর ভাষায়—"বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হইবে না; যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে।"[১৩]

সামাজিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে স্বামীজী শিক্ষার প্রসারের ওপর খুব জোর দিয়েছেন, কিন্তু সেই সাথেই বলেছেন যে শিক্ষার সাথে সাথে কৃষ্টি (উন্নত সংস্কৃতি) প্রসারও দরকার—"মজ্জাগত হইয়া শিক্ষা কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। আমরা সকলেই আধুনিক কালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি

ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—অসভ্য ; কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব।…জনসাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে…তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত তাহা না করিতে পারিতেছ, ততদিন জনসাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। উপরন্তু একটি নতুন জাতির (গোষ্ঠীর) সৃষ্টি হইবে যে জাতি অপর সকলের উপরে উঠিবে ও প্রভুত্ব করিবে।"[১৪] স্বামীজীর এই কথার তাৎপর্য স্বীকার করেছেন আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদেরা। তাঁরাও দেখেছেন যে শিল্পায়ন ও উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটলেই মানুষের সংস্কার যায় না।[১৫]

নতুন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি

জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে স্বামীজী আরেকটি প্রধান বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন—নতুন জাতীয় উচ্চাশার (national ambition) উদ্বোধন। এই নব আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের মনে সঞ্চার করতে পারলে সংহতি এক নব-দিগন্তের সন্ধান দেবে। কি হবে সেই উচ্চাশা ? রাশিয়া ও চীনের কম্যুনিস্ট নেতারাও জাতির সামনে এক নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষা রেখেছিলেন—সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পত্তন কর এবং উৎপাদনে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাও। কিন্তু এই উচ্চাশার পেছনে যে সেই প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব লুকিয়ে আছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে ঐ দেশ দুটি উন্নত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেইসাথে নব-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে।

স্বামীজী ভারতীয়দের সামনে যে নতুন উচ্চাশা রাখলেন তা হল, জ্ঞানে-কর্মে প্রাচীন ভারতকে ছাড়িয়ে যাওয়া। প্রাচীন ভারত তার জ্ঞান-বিজ্ঞান-স্থাপত্য-দর্শন-শিল্পে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ; তার সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন জাতি এসেছে ভারতকে লুণ্ঠন করতে, এসেছিলেন বহু বিদ্যানুরাগী মানুষ ভারতে জ্ঞান ও ধর্মের আকর্ষণে। স্বামীজী ভারতীয়দের ডাক দিলেন এমন এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে যার কৃতিত্ব প্রাচীন ভারতকেও ম্লান করে দেবে। রাশিয়া-চীনের নেতাদের সাথে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সহজেই ধরা যায়। স্বামীজীও প্রতিযোগিতা চেয়েছেন, তবে অন্য পথে—গৌরবে নিজেদের অতীতকে অতিক্রম করে।

এর সাথেই মনে করিয়ে দিলেন—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"।[১৬] প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটবে এই দেশে এবং সেই

সাথেই উত্তর দিতে হবে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের। কি সেই প্রশ্ন? শান্তি না যুদ্ধ, সহনশীলতা না অসহিষ্ণুতা, সততা না ধূর্ততা, বুদ্ধিবল না বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা না ঘোর জড়বাদ—শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর সামনে রাখার জন্য স্বামীজী ভারতীয়দের আহ্বান করেছেন। বলেছেন—"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর।"[১৭]

ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে নতুন সভ্যতার দিগ্‌নির্দেশ করার জন্য—এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষাই (national aspiration) স্বামীজী ভারতীয়দের মনে অঙ্কিত করে দেবার কথা বলেছেন। ভারতীয়দের জাতীয় সংহতি শুধু ভারতের জন্য নয়, পৃথিবীর জন্য।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

"পরিব্রাজক" বইটিতে বিবেকানন্দ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সাথে "বর্তমান ভারত" "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বই দুটি এবং "পত্রাবলী" ও বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি এ-প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। দুটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে তিনি যে চারটি বিষয়ের ওপর নজর দিয়েছেন তা হল: (১) দুটি দেশের রাষ্ট্র-চরিত্র; (২) পরস্পরের প্রতি গণমানসের দৃষ্টিভঙ্গি; (৩) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে মিল-অমিল; (৪) পারস্পরিক সম্পর্কের টানা-পোড়েন; (কোন্ বিষয়ে ও কতটা)। এই বিষয়গুলির ওপর সামাজিক-ঐতিহাসিক-পারিপার্শ্বিক ও নেতৃত্বের শক্তি কি-রকম প্রভাব ফেলেছে বা কিভাবে প্রভাবিত করেছে এ-প্রসঙ্গও এইসাথে বিবেচ্য। রাষ্ট্র ও সমাজে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দুটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে লক্ষনীয় হয়ে দেখা দেয়।

রাষ্ট্রীয় চরিত্রে বিভিন্ন অবস্থা যে শুধু ঐতিহাসিক কারণে হয় তা নয়, দুটি দেশের রাষ্ট্রচরিত্র বা শাসকশ্রেণীগুলির চরিত্র একে শক্তিশালী করে তোলে। বিবেকানন্দের মতে বৈশ্যশাসনে রাষ্ট্র-সংগঠন ব্রাহ্মণশাসন পর্বের চেয়ে বেশি বিকশিত হয়, রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধি পায়, এবং সবার জন্য সমান আইন তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পায়; বিপরীত দিকে ব্রাহ্মণশাসনে রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকে সঙ্কুচিত,

ধর্মীয় মতাদর্শ প্রধান ভূমিকা নেয়। এভাবেই ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রাধান্য (Primacy of State) এবং ভারতীয় উপমহাদেশ সহ বহু মুসলমান দেশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রাধান্য (primacy of culture) জোরালো হয়ে উঠেছে।

এর ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, বৃটিশ ভারতের হিন্দু ধর্ম-নেতারা—রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ—বৃটিশের সদ্‌ভাবাত্মক দিকগুলিকে ধরতে পেরেছিলেন এবং জাতিকে আধুনিক করে তোলার জন্য হিন্দু চিন্তাধরা ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন চেয়েছিলেন, এবং এভাবে primacy of State তত্ত্বকে দেশজ ভাষায় দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। বিপরীত দিকে বৃটিশদের প্রতি মুসলমানদের বিরাগ থাকায় (রাজ্য হারানোর ফলে) মুসলমান ধর্মনেতারা এদিকে নজর দেননি। ফলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ বহুবিবাহ ইত্যাদি বন্ধ করতে চাইলেও মুসলমান নেতারা সমাজ-পরিবর্তনে এ-ধরণের চেষ্টা করেননি। এর ফল স্বাধীনতা পরবর্তি ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলিতে পড়েছে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এশিয়ায় ধর্ম এবং ইওরোপে রাজনৈতিক ঐক্য জাতি গড়ে তোলে। বস্তুত তার কথা আজও প্রাসঙ্গিক। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম, ব্রহ্ম ও শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম, নেপালে হিন্দু ধর্ম জাতি-গঠনে প্রধান ভূমিকা নিতে চেয়েছে। ইরান-ইরাক-জাপান-থাইল্যাণ্ড-ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই দিকটি লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলন যে ধর্মের পুনরুত্থানের সাথে বিপদের (গোঁড়ামী) আশঙ্কাও থাকে। পাকিস্তানের পরিস্থিতি, ইরান-ইরাক যুদ্ধ (শিয়া ও সুন্নী সংঘর্ষ), ভারতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সাম্প্র-দায়িক শক্তিগুলির জোরালো হয়ে ওঠা এই আশঙ্কাকেই প্রমাণ করে। এমন-কি শ্রীলঙ্কায় যে তামিল-সিংহলী সংঘর্ষ তার মূলেও আছে বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা যা শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সালে।

বিবেকানন্দ তাই মতাদর্শের (ideology) সাথে শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ভারতের ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করে-ছিলেন, বর্ণ-ভাষা-ধর্ম-ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ বহু বিবাদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন বলে সবাইকে নিয়ে একটি জাতিতে রূপান্তরিত করাই সমস্যা। স্বাধীন ভারতেও এইটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। পুরণো ধরণের আনুগত্যগুলির বদলে

নতুন ধরণের আনুগত্য গড়ে তোলা, উপ-জাতীয়তা (sub-nationalism) দূর করা, এবং অধিকাংশ ভারতীয় যারা অনাধুনিক (non-modern) চিন্তা-ধারায় অভ্যস্ত, তাদের কিভাবে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবহার ধারায় নিয়ে আসা যাবে সেটা বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ তাঁর প্রাজ্ঞদৃষ্টিতে এই সমস্যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন "পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে তরুণতম"[১৮] বলে। এই উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে তিনি বহুবার "প্রাচীন" বলেও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে "তরুণতম" শব্দটি প্রয়োগ করলেন। এর তাৎপর্য কি? ভবিষ্যতে ভারতীয়রা এমন এক জাতি হয়ে উঠতে যাচ্ছে যার চরিত্র আধুনিকতায় তরুণতম। বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভারতের মতো আমেরিকা-রাশিয়া-চীনেও বিভিন্ন ভাষা-ধর্ম-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন জাতি গড়ে উঠছে। কিন্তু পার্থক্য—আমেরিকার "melting pot"-এ বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে, রাশিয়া ও চীনে এককেন্দ্রিক সমন্বয় সম্ভব হচ্ছে (monolithic) রাষ্ট্রের চাপে। বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে যে সমন্বয়ের চেষ্টা, তা শুধু ভারতেই কিছুটা দেখা যায়। এই পরীক্ষায় ভারত যদি সফল হয় তবে তা হবে ইতিহাসের এক লক্ষণীয় উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত। এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই জাতীয় রাষ্ট্র; রাশিয়া-চীনে রাষ্ট্রীয় জাতি, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়ে। আর ভারতে পরীক্ষা চলেছে রাষ্ট্রকে এ-রকম অসীম ক্ষমতা না-দিয়েও এক জাতি এক প্রাণ গড়ে তোলার। ভারতের ইতিহাসে এমন ব্যাপক পরীক্ষার প্রয়াস আগে বিশেষ দেখা যায়নি। "তরুণতম" শব্দটির সাহায্যে বিবেকানন্দ স্পষ্টই বোঝালেন যে প্রাচীন ধরণে (অর্থাৎ এশিয়ায় জাতিই রাষ্ট্র তৈরী করে) নয়, আবার ইউরোপীয় ধরণেও (অর্থাৎ ভাষা-ভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্র) নয়, ভারতের সামনে পরীক্ষা ও পথ একেবারে আধুনিক।

বস্তুত, এটাই ভারতের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধানতম। দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মীয় ও ইথনিক্ গোষ্ঠী ইত্যাদি যে দাবি তুলছে—যার ফলে sub-nationalism ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে—তার কারণই হল ভারতের এই নতুন জাতিতত্ত্বের তাৎপর্য বুঝতে না পারা। হিন্দু রাষ্ট্র, দ্রাবিড়স্থান, খালিস্তান, মোপলাপুরম্ (কেরালা), কাশ্মীরের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা, ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড ইত্যাদি দাবির পেছনে যে মানসিকতা কাজ করছে তা

হল জাতীয় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-অনুসন্ধানী জাতীয়তার মানসিকতা। ফলে তামিলনাড়ুর লোকেরা শ্রীলঙ্কার তামিলদের সাথে এবং কাশ্মীরের মুসলমানেরা পাকিস্থানের সাথে একাত্মবোধ করছে, উগাণ্ডায় ভারতীয়-বিতারণে এ-দেশের গুজরাটীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠছে। যেহেতু ভারতের মন্ত্রীরা ভোটের মাধ্যমেই ক্ষমতালাভ করেন সেহেতু তাদের পক্ষে এই. দাবিগুলি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না যদিও ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির এই extra territorial আত্মীয়তা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সাথে সামঞ্জস্যহীন! আর, এই দাবিগুলি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই ভারতকে মাঝে মাঝেই এমন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে যা প্রতিবেশী দেশগুলির চোখে বড়দাদাসুলভ মনোভাব হিসেবে মনে হচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় তামিল-প্রসঙ্গ, নেপালে ভারতীয়-প্রসঙ্গ ইত্যাদি এরই প্রতিফলন। বিপরীত দিকে পাকিস্তানের মুসলমানেরাও ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি এ-রকম extra-territorial আত্মীয়তা অনুভব করে। এই বিষয়টি প্রতিবেশী সম্পর্কে বিশেষ সমস্যা নিয়ে এসেছে।

পুরোহিত-শাসন ও বৈশ্য-শাসনের পার্থক্য বিবেকানন্দ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রথমটিতে ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকে, প্রাচীন জ্ঞান যুগোপযোগী করা (modernisation) হয় না, নতুন বিদ্যার প্রতি বিরাগ থাকে, এবং নিজের রচিত শৃঙ্খলে নিজেরই গতি রুদ্ধ হয়। বিপরীত দিকে বৈশ্যশক্তি আধুনিকতায় বিশ্বাসী এবং বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে চায়। অর্থাৎ পুরোহিত শক্তি বদ্ধ ব্যবস্থা (closed system) এবং বৈশ্য-শক্তি মুক্ত ব্যবস্থা (open system) পছন্দ করে।

পাকিস্তান ও ভারতের দিকে তাকালে বিষয়টি বোঝা যাবে। ভারতে বৈশ্যশাসন থাকায় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক এই চারটি ক্ষেত্রেই আধুনিকতার সঞ্চার হয়েছে যা পুরোহিত-তন্ত্রে-শাসিত কিছু কিছু দেশে হয় নি। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুরোহিত-শক্তিকে দমন করে আধুনিক বিশ্ব সাংস্কৃতির দিকে যাত্রা করার ব্যাপারে ভারত অনেকটা সফল হয়েছে। যদিও ঐতিহাসিক পরম্পরা (রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ) এ-বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করেছে, তবুও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পুরোহিত-শক্তি বেশ কয়েকবারই মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে সংস্কৃতির আধুনিকীকরণ অনেকটা সম্ভব হয়েছে। বিপরীত দিকে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে এটি সম্ভব হয়নি পুরোহিত-শাসনের জন্য। অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে সম-বণ্টন এখনও সম্ভব না হলেও ভারত এ বিষয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে প্রথম থেকেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে। এসব সম্ভব হয়েছে মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার ফলেই।

বিবেকানন্দ পুরোহিত-শাসনের বদ্ধ ব্যবস্থা (closed system) সম্বন্ধে যা বলতেন সে-কথাই আধুনিক সমাজবিদ্‌রা প্রকাশ করেছেন অন্য ভাষায়। যারা সাংস্কৃতিক প্রাধান্যকে (primacy of culture) তুলে ধরে (অর্থাৎ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে যারা পুরোহিত-শক্তির প্রতিনিধি) তাদের সম্পর্কে আধুনিক সমাজবিদ্‌রা মনে করে যে সমাজ-পরিবর্তনের নতুন পথ মানুষকে রাষ্ট্রের অধীন হতে বাধ্য করবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতোই; এরা মনে করে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অর্থ রাষ্ট্রের নিপীড়ন মূলক ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া। এজন্য এরা আধুনিক চিন্তাধারা ও ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ জানায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে—যা পৃথিবীর বহু দেশেই দেখা যাবে।

এইসব আভ্যন্তরীন ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয়, সে-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কতগুলি মূল্যবান মন্তব্য করে-ছিলেন গত শতাব্দীতে। প্রথমত দেশের বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি না থাকলে অন্য রাষ্ট্র সেই দেশের স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসবাসের অঞ্চলকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি-সমাজনীতির সমস্যা শুধু জাতীয় ভিত্তিতে নয়, দরকার আন্তর্জাতিক ভিত্তি থেকেও সমাধান করা। তৃতীয়ত, একটি দেশের ঐক্য বল-প্রয়োগে স্থাপিত হলে যে গোষ্ঠী প্রধান (অর্থাৎ শক্তির সাহায্যে ঐক্য স্থাপন করেছে যে-গোষ্ঠী) তার শক্তি নষ্ট হলে অন্যান্য সৌধগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। চতুর্থত, শুধু মতাদর্শগত পরিবর্তন নয়, যে বিভিন্ন উপাদানে জাতি গঠিত হয় সেগুলির সমীকরণ দরকার।

ভারতীয় সমাজে আজ দুই ধারা ক্রিয়াশীল। একটি ধারা গোষ্ঠীচেতনাকে ভিত্তি করে সমস্যা দূর করায় সচেষ্ট। অন্য ধারাটি নতুন ভারতীয়ত্ব বোধের উদ্‌গাতা। স্বামী বিবেকানন্দ আশা প্রকাশ করেছিলেন যে দ্বিতীয় ধারাটিই শেষ পর্যন্ত জোরালো হয়ে উঠবে। এভাবেই গড়ে ওঠা নতুন জাতির অনুপ্রেরণার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের সমস্যা থেকেই যাবে।

তিন ঃ সামাজিক বিন্যাস ও গোষ্ঠী সম্পর্ক

যে কোন সমস্যার সমাধান একমাত্র মানুষের দ্বারাই সম্ভব। মানুষকে না জানলে কোন সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বিবেকানন্দ-মননলোকে কোন দেশের গণচেতনার স্তর বুঝতে গেলে ঐ দেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস নির্ধারণ করা দরকার। এই স্তর বিন্যাসে বোঝা যায় যে, সমাজকে কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণী প্রভাবিত করছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে থেকে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করে দেখতে হয় এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি-ধরণের। এরপর সামাজিক মৌল শক্তি-গুলি কিভাবে কেন্দ্রীভূত বা বিকেন্দ্রায়িত হচ্ছে তা আলোচনা করে রাজশক্তি ও লোকশক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার্য। এর দ্বারাই লোকশক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা যায়। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সমাজ বিশ্লেষণ করলে তবেই গণচেতনার স্তরটি বোঝা যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা সমাধানের পথ পেতে পারি।

স্বামীজী চারটি সামাজিক শক্তি-গোষ্ঠীর উল্লেখ করে সমাজের শ্রেণীবিন্যাস বুঝিয়েছেন। শ্রেণী নির্ধারিত হবে কিভাবে? একটি গোষ্ঠী কোন্ মৌল শক্তির সাহায্যে সমাজে নিজস্ব স্থিতি বজায় রাখছে, সেই শক্তির বিচারেই স্বামীজী ঐ বিশেষ গোষ্ঠীর শ্রেণী-নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান (বিদ্যা-বুদ্ধি), শৌর্য (অস্ত্রশক্তি, বাহুবল), অর্থ এবং কায়িক শ্রম, এই চারটি হল সামাজিক মৌল শক্তি। এগুলিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণী। বর্তমান ভারতে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রধানত বুদ্ধিজীবী, আমলা ও ধর্মনেতারা। বুদ্ধিজীবীদের অবশ্য তিনটি উপবিভাগে পাওয়া যায়—প্রথমত শিক্ষক-গবেষক-বিজ্ঞানী, দ্বিতীয়ত আইনজীবী, এবং তৃতীয়ত সাংবাদিক (প্রেস)। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর মধ্যে পড়বে সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ, এবং বিশেষত মাফিয়া, মস্তান, সমাজবিরোধী ইত্যাদি। বৈশ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ধনী চাষী ও রাজনৈতিক নেতা। শূদ্রশ্রেণীর বিস্তার অন্য তিনটি চেয়ে বেশি—ছোটশিল্পের মালিক, সংগঠিত শ্রমিক,

ছোটচাষী, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, গ্রামের কামার-কুমোর, শহরের হকার, রিক্সাওলা, এমন-কি সরকারী, বেসরকারী অফিসের কেরাণীরাও।

প্রভাবশালী গোষ্ঠীসমূহ

প্রতিটি শ্রেণীতেই বিভিন্ন পেশার লোক রয়েছে, কিন্তু সমাজে সবার প্রভাব সমান নয়। সুতরাং এদের মধ্য থেকে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলিকে বেছে নেওয়া দরকার। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শিক্ষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সমাজে এদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়। একই অবস্থা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের। আইনজীবীরা প্রভাব রাখলেও তা আইনজীবী হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। এদিক থেকে প্রেস এবং আমলারা নিজস্ব গোষ্ঠী-অস্তিত্বেই সমাজে বেশি প্রভাবশালী। ধর্মনেতাদের প্রভাবও ভারতীয় জনমানসে খুব বেশি। আমলাদের প্রভাবের বড় কারণ প্রথমত অধিকাংশ মন্ত্রীই প্রশাসনিক ও নীতিগত কর্মদক্ষতায় আশানুরূপ নন, যার ফলে তারা শেষপর্যন্ত আমলাদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভা পরিবর্তিত হলেও এদের স্থিতি বিঘ্নিত হয় না। তৃতীয়ত, লাইসেন্স-পারমিট দেবার ব্যাপারে এদের ক্ষমতা বেশি। চতুর্থত, সরকারী কাজের বিস্তৃতি ও জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকারে সচিব পর্যায় পদ ১৯০০ সালে ছিল ৭০০, ১৯০০-তে তা বেড়ে হয়েছে ৭০০। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর নামে ক্রমশ বেশি সংখ্যক সংস্থার জাতীয়করণের সাথে সাথেও এদের প্রভাব বাড়ছে। ভারতীয় প্রেস উত্তেজনামূলক সংবাদকে ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। ফলে সরকারের গাফিলতি খবরের কাগজে স্থান পায়। ভাগলপুর জেলে বন্দীদের অন্ধ করে দেওয়া, আন্তুলে ট্রাস্ট, মধ্যপ্রদেশে পুলিশী অত্যাচার, দিল্লী ও অন্যান্য শহরে গোয়েন্দা কর্তৃক চিঠিপত্র খোলা, তিহার জেলে চূড়ান্ত অব্যবস্থা, রাজনীতিবিদদের গোপন কার্যকলাপ ইত্যাদি প্রকাশ করে সংবাদ-পত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে সমাজে। তাছাডা জনস্বার্থের মামলায় উদ্যোগী হয়ে সংবাদপত্র ও নাগরিক অধিকার রক্ষা সংস্থাগুলি বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ছোট-ছোট সংবাদপত্রগুলিও জনমানসকে প্রভাবিত করতে পারছে। যদিও বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী পত্রিকার সত্যনিষ্ঠা তর্কাতীত নয়, তবুও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে অনেকটা

সবল ভূমিকা নিচ্ছে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েও।

ক্ষত্রিয় শ্রেণী অর্থাৎ প্রধানত অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী পুলিশ ও সমাজবিরোধী বিশেষত মাফিয়া গোষ্ঠী। যদিও সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, তবুও ভারতে এই গোষ্ঠী জনমানসে কোন প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেনি পাকিস্তান-বাংলাদেশ-চিলির মতো। পুলিশ যে স্বকীয় সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং জনজীবনে বড় ভূমিকা রাখছে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন আদালত ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছে। আর সমাজবিরোধী বা গুণ্ডা বাহিনী ও মাফিয়া যে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে সে-কথা আলাদা করে বলার দরকার নেই।

বৈশ্যশ্রেণীর মধ্যে ব্যবসায়ী, ধনী চাষী ও রাজনৈতিক নেতারা সবচেয়ে প্রভাবশালী। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির মধ্যে এখানে পার্থক্য রাখা হচ্ছে। শিল্পপতি নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য বিক্রী করে কিন্তু ব্যবসায়ীরা মিড্‌ল্‌ম্যানের কাজেই বেশি উৎসাহী। ব্যবসায়ীরা নিজেরা পণ্য-উৎপাদনে তেমন আগ্রহী নয়, তাছাড়া শিল্পপতি যেমন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে বাজারে প্রবেশ করে ব্যবসায়ীরা তার বদলে ফাটকা খেলাতেই (gambling) বেশি আগ্রহী। বর্তমান ভারতে শিল্পপতিরা নন, ব্যবসায়ীরাই অধিকতর প্রভাবশালী গোষ্ঠী। শিল্পপতিরা যেমন শিল্প-প্রসারে উদ্বৃত্ত সম্পদ নিয়োগ করে, ধনী চাষী সে-রকম করে কৃষির প্রসারণে। জমিতে যন্ত্র ব্যবহার করে, সার-বীজ-ওষুধ কিনে, নতুন জমি বেনামীতে কিনে এরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে নজর দেয়। অবশ্য এরা ব্যবসায়ীদের মতো কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রেও পুঁজি নিয়োগ করে—যেমন গ্রামে-গঞ্জে মুদীর দোকান দেওয়া, সিনেমা-হলের মালিক হওয়া কিংবা পারমিট নিয়ে বাস বা সাইকেল-রিক্সা ব্যবসায় নামা ইত্যাদি, কিন্তু তা খুবই সীমিত ক্ষেত্রে।

শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী কেরাণীকুল। এই গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি শিক্ষিত হওয়ায় এবং গলার জোর (vocal power) থাকায় এরা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। সংগঠিত শ্রমিকেরাও শক্তিশালী কিন্তু যেহেতু শিক্ষায় অনগ্রসর এবং রাজনৈতিক নেতাদের অধীনে সেহেতু এরা এখনও তেমন প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

সুতরাং, আমরা ভারতীয় সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী মোট আটটি গোষ্ঠীর সন্ধান পাচ্ছি। ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে আমলা ও প্রেস, ক্ষত্রিয়শ্রেণীর মধ্যে পুলিশ ও মাফিয়া, বৈশ্যশ্রেণীর অন্তর্গত ব্যবসায়ী ধনী চাষী ও

রাজনৈতিক নেতা এবং শূদ্রদের মধ্যে কেরাণী গোষ্ঠী ও শ্রমিক যথাক্রমে বিদ্যা-বুদ্ধি, অস্ত্র, অর্থ ও কায়িক শ্রমকে ভিত্তি করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এবং নিজস্ব গোষ্ঠীসত্তা সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন হয়েছে। (মার্কস যাকে বলেছেন class for itself, অনেকটা তা-ই বোঝাচ্ছি "নিজস্ব গোষ্ঠীসত্তা সম্বন্ধে সচেতন" বলতে। তবে মনে রাখতে হবে মার্কসের "class" এবং বিবেকানন্দের "শ্রেণী" এক ব্যাপার নয়।)

পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বামীজীর সমাজ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা বর্তমান ভারতের সামাজিক স্তরবিন্যাসের অনুধ্যান অর্থাৎ সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করলাম। এবার দেখা প্রয়োজন, এই গোষ্ঠীগুলি সমাজে নিজস্ব স্থিতি বজায় রাখছে কিভাবে এবং দ্বিতীয়ত এই স্থিতি কি সামগ্রিক সমাজের দিকে তাকিয়ে এরা নির্ধারিত করছে অথবা সমাজের সামান্য কিছু বিষয় কেন্দ্র করে এদের অস্তিত্ব? স্বামীজী "বর্তমান ভারত" বইয়ে ক্ষত্রিয়-শাসন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।"[১] অর্থাৎ তিনি এখানে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই পারস্পরিক সম্পর্ক বের করার প্রাথমিক কাজ হিসেবে আমাদের দেখতে হবে গোষ্ঠীগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজে কার ওপর নির্ভরশীল, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কাদের সাথে, এবং কাদের সাথেই বা ঘৃণা ও প্রেমের সম্পর্ক (love and hate relationship)।

আমলারা যেহেতু সরকারেরই অঙ্গ, সেহেতু এরা সরকারের ওপর নির্ভরশীল। সংবিধানে সংসদ ও প্রশাসনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও মন্ত্রীরা প্রশাসনে সর্বস্তরেই নাক গলাতে উদ্যোগী এবং অপছন্দ হলেই আমলাকে বদলী করে দেওয়া হয়। এটা যে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারেই ঘটে তা নয়, পশ্চিমবঙ্গের মতো মার্কসবাদী সরকারেও চলে। বিপরীতদিকে বিরোধী দলের নেতারাও আমলাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং গ্রামে ও মফঃস্বল শহরে সরকার-বিরোধী আন্দোলন আমলাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। এসব কারণে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এদের অনেকটা শত্রু-সম্পর্ক। আর শিল্পপতিদের সাথে প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক। ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স না নিয়েও অবৈধভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পায়, কিন্তু শিল্পপতিদের পক্ষে তা সম্ভব হয়না। শিল্প-

পতিদের অভিযোগ— সহজে লাইসেন্স পারমিট দিতে চায়না আমলারা। আর আমলাদের অভিযোগ—শিল্পপতিরা মুনাফা নিয়ে এতে উৎসাহী যে এতে সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবশ্য শিল্পপতিরা অনেক সময় আমলাদের নানারকমভাবে কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে।[২] এমন-কি ঘনশ্যামদাস বিড়লাও মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করতেন আমলাদের ওপর।[৩]

সংবাদপত্রের (প্রেস) অধিকাংশ পাঠকই মধ্যবিত্ত বলে প্রেস এদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞাপন ছাড়া কাগজ চলেনা সেহেতু বিজ্ঞাপনদাতা অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে প্রেসের সম্পর্ক প্রেম ও ঘৃণার। প্রেস এই দুই দলকেই বেশি expose করে, আবার এই দুই দল প্রেসকে খুশি রাখার জন্য এবং প্রয়োজন মতো বিপদে ফেলার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে।

পুলিশ সরকারেরই অঙ্গ বলে আমলাদের মতো সরকারের ওপরই নির্ভরশীল। ব্যবসায়ীরা পুলিশের বন্ধু, কারণ অবৈধ কিছু চালাতে হলে অন্তত স্থানীয় স্তরে পুলিশের সাথে বন্ধুত্ব রাখতেই হয়। বিপরীতদিকে, পুলিশে দুর্নীতির একটি বড় কারণও তাই। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে পুলিশের প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক। গণতান্ত্রিক দেশে সরকার-বদল স্বাভাবিক ঘটনা বলে বিভিন্ন দলের নেতাদের সাথে পুলিশকে ভাল সম্পর্ক রাখতে হয়, আবার সরকার-বিরোধী আন্দোলনের চাপটাও পুলিশকে খুব বেশি সহ্য করতে হয়।

সমাজবিরোধীরা (মাফিয়া ও মস্তানগোষ্ঠী) সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল রাজনৈতিক নেতাদের ওপর, কারণ এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন না পেলে পুলিশও এদের শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনা। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতা ও মাফিয়া এই দুয়ের সম্পর্কে পারস্পরিক নির্ভরতার হেতু—বিরোধী দলকে পর্যুদস্ত করায় ও নির্বাচনে মাস্তানেরা বড় সহায়। মাফিয়া নামধারী সমাজবিরোধীদের পেছনে ব্যবসায়ীরাও থাকে, কারণ চুরির জিনিষ বিক্রীর ভারটা ব্যবসায়ীরাই নেয়। বিপরীতদিকে, ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসার নিরাপত্তার জন্য এদের কাজে লাগায়। অতএব ব্যবসায়ী ও পুলিশকে সহজবোধ্য কারণেই মাফিয়ারা বন্ধু হিসেবে গণ্য করে।

ব্যবসায়ীরা পণ্যবিক্রীর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ওপর। গ্রামাঞ্চল থেকে যে শহরে চালের চোরাচালান হয় তার

প্রধান ক্রেতা মধ্যবিত্তেরাই। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন মার্কেট-রিসার্চ সংস্থার অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রেফ্রিজারেটার-টেলিভিশন-স্কুটার-মোটরসাইকেল-সিন্থেটিক কাপড়-প্রেসার কুকার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক গ্যাজেটের প্রধান ক্রেতা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এইসব ভোগ্য-বিলাস দ্রব্যের বিক্রীর ফলে লাভবান হচ্ছে শিল্পপতিরা, কিন্তু বাস্তব তথ্য এই যে এসব বিক্রীর জন্য শিল্পপতিরা নির্ভর করে ডীলার এজেন্টদের ওপর—যারা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু রাজনৈতিক নেতারা। দলীয় তহবিলে গোপন চাঁদা তো দিতেই হয়, তাছাড়া মাঝারী ও ছোট নেতাদেরও হাতে রাখতে হয় দৈনন্দিন ব্যবসার খাতিরে। ব্যবসায়ীদের সাথে প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক আমলাদের। আমলা, আয়করকর্মী ছাড়াও ভিজিলেন্স বিভাগ ব্যবসায়ীদের ঘুম যেমন কেড়ে নিতে পারে, তেমন সুনিদ্রার ব্যবস্থাও করতে পারে।

রাজনৈতিক নেতারা সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে সাধারণ মানুষের, বিশেষত শূদ্রশ্রেণীর ওপর। গণতন্ত্রে লোক-সংগঠন যেহেতু নেতৃত্বের প্রধান factor সেহেতু নেতারা এদের ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। তবে ভোটের ব্যাপারে শুধু লোকসংখ্যাই নয়, টাকা ও অস্ত্র বড় ভূমিকা নিচ্ছে এদেশে। টাকার জন্য—নির্বাচনে ও দৈনন্দিন দলীয় খরচে (ব্যক্তিগত ব্যাপারটা না তুললেও)—নেতারা নির্ভর করে ব্যবসায়ী ও ধনী চাষীর ওপর। শিল্পপতিরাও টাকা দেয়, তবে দাতার সংখ্যা ধরলে এদের চেয়ে ব্যবসায়ীদের সংখ্যাই বেশি, বিশেষত গ্রামে ও শহরে পাড়াগুলির ছোট নেতারা ব্যবসায়ীদের ওপরই মূলত নির্ভর করে টাকার জন্য। শুনতে হয়ত আশ্চর্য লাগবে, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত-প্রভাব বেশি হলেও নেতাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বিভিন্ন নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে, এই সম্প্রদায় ক্রমশই floating voter-এ পরিণত হচ্ছে এবং কোনও বিশেষ দলের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করছে। উচ্চবিত্ত পরিবারে সাধারণত বাবা ও ছেলে একই দলের সমর্থক, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে চলছে অন্য ধারা। প্রেসের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের যে প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক এ-কথা আগেই বলা হয়েছে।

ধনী চাষীর মূল লক্ষ্য উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং একাজে এখনও বর্গাদার-ক্ষেতমজুরের শ্রম বড় সহায়। তাছাড়া ছোট ও প্রান্তিক চাষী যতই নিজ জমি চাষ করতে অসুবিধা ভোগ করবে Un-economic Holding-এর জন্য, ততই তারা ধনী চাষীদের কাছে নিজেদের জমি ভাগে দিতে উদ্যোগী হবে। এসব

কারণে ছোট চাষী-বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের ওপর ধনী চাষীরা এখনও নির্ভরশীল। ধনী চাষীদের বন্ধু হল রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী এবং গ্রামের ছোট আমলা বা সরকারী প্রশাসক। ধনী চাষীদের উৎপাদন যতই বাড়ুক, ব্যবসায়ীরা সহায় না হলে লাভজনক দাম বা বিক্রী কোনটাতেই সুবিধা হয়না। বেনামী জমি রাখা এবং বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন ঠেকাবার জন্ত রাজনৈতিক নেতারাই বড় সহায়। সরকারী প্রশাসক বিশেষত বি.ডি.ও., থানার অফিসার, রাজস্ব-সংগ্রহকারী কর্মচারীও ধনী চাষীদের বন্ধু।[৪]

কেরাণী বলতে সরকারী ও বেসরকারী সবরকম অফিসের কেরাণীদেরই বোঝান হচ্ছে। এরা আমলা ও পুলিশের মতো সরকারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। বরং বলা যায় সংখ্যাগত বিস্তৃতি এবং গলার জোরের ওপরই এদের দাবি পেশ করা হয়। শিক্ষকদেরও এই বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু কেরাণী-ধর্মঘটে প্রশাসন ও ব্যবসা মার খায় যা শিক্ষক-ধর্মঘটে হয় না। তাছাড়া জনসাধারণ শিক্ষকদের চেয়ে বেশি নির্ভর করে কেরাণীদের ওপর, কারণ অফিসে ব্যাঙ্কে, ডাকঘরের কাজকর্মে ও বিভিন্ন ব্যাপারে সার্টিফিকেট আদায় করা ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজে কেরাণীদের ভূমিকা অনেক বেশি। কেরাণীদের বড় বন্ধু রাজনৈতিক নেতা, কারণ কোন্ দলের সাথে তাদের ইউনিয়নের সংশ্রব তার ওপর দাবি-দাওয়ার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। সরকারের সাথে অবশ্য এদের সম্পর্ক প্রেম ও ঘৃণার। সরকারী অফিসে অতিরিক্ত ডি-এ ও বেতনহার সংশোধনের ব্যাপারে এবং বেসরকারী অফিসে পণ্যমূল্যসূচক (pricc index) এই দুটিই মূলত সরকার ঠিক করে দেয়। আবার সরকারের নানান বিধি-নিষেধ (কম্পালসারী ডিপজিট স্কীম, ওভারটাইম কম করা, অফিসে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ ইত্যাদি) এদের বাধা দেয়।

সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির বিন্যাস ও অবস্থান নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল সংক্ষেপে।

গোষ্ঠী	মূল নির্ভরতা	বন্ধু	শত্রু	ঘৃণা-প্রেমের সম্পর্ক
আমলা	সরকার	ব্যবসায়ী	রাজনৈতিক নেতা	শিল্পপতি রাজনৈতিক নেতা
প্রেস	মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়			সরকার
পুলিশ	সরকার	ব্যবসায়ী		রাজনৈতিক নেতা
মাফিয়া	রাজনৈতিক নেতা	ব্যবসায়ী, পুলিশ		
ব্যবসায়ী	মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়	রাজনৈতিক নেতা		আমলা
রাজনৈতিক নেতা	শূদ্রশ্রেণী	ব্যবসায়ী, ধনী চাষী, মাফিয়া	মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়	প্রেস্
ধনী চাষী	ছোট চাষী, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর	রাজনৈতিক নেতা ব্যবসায়ী, গ্রামীণ সরকারী প্রশাসক	শিল্পপতি	সরকার
কেরাণী		রাজনৈতিক নেতা		সরকার

কেন্দ্রীকরণ-বিকেন্দ্রীকরণের বৈশিষ্ট্য

বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সমাজ-বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকাঠামো ও উৎপাদন-ব্যবস্থাই সব নয়, বরং সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে কোন ধরণের সামাজিক মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠছে সেটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। বর্তমান ভারতে এই বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করলে দেখা যায়, আগের চেয়ে রাজনীতিকরণ অনেক বেশি ঘটেছে এবং সামাজিক স্তরগুলি পরস্পরের সম্পর্কে নানান স্বার্থ ও সংঘর্ষে বিন্যস্ত হয়ে স্তরবিন্যাসকে অনেক বেশি জটিল করে তুলেছে। পথমটির প্রসঙ্গে বলা যায় যে অতীতে রাজশক্তি ও লোকশক্তির সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হত কিন্তু বর্তমানে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সবক্ষেত্রেই চলছে সহযোগিতা এবং বিরোধিতার নানান ক্রিয়া। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সামাজিক স্তরগুলি যেমন এই ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্র করে রয়েছে, তেমনি এই ক্ষেত্রগুলির বাইরে নানা ধরণের বৃত্ত তৈরী করছে। এই বৃত্তগুলির মাধ্যমে আবার প্রকাশিত হচ্ছে মানবিক সম্পর্কের নানান মাত্রা (dimension)। সামাজিক অস্তিত্বের এই মাত্রাগুলি শুধু অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে তা হবে অসম্পূর্ণ কারণ সেটি হবে একমাত্রিক। কিন্তু সামাজিক চেতনা কখনই একমাত্রিক নয়, ব্যক্তি-চেতনার মতোই এটি বহুমাত্রিক। এবং এজন্যই দরকার এই বহুমাত্রিকতার একটি সাধারণীকরণ (generalisation)। এই সাধারণীকরণ প্রথম বিশ্লেষণে বিমূর্ত যা গড়ে ওঠে সামাজিক মৌল শক্তিগুলিকে (জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও কায়িকশ্রম) ভিত্তি করে মানবিক সম্পক সমূহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে। এই সম্পর্ক-গুলির মধ্যে যে বিভিন্ন গতি (সহযোগিতা ও সংঘর্ষের) রয়েছে সেগুলির ঝোঁক (trend) বের করতে পারলে তখনই বিমূর্ত সাধারণীকরণ (সামাজিক স্তরবিন্যাস) থেকে বিশ্লেষণে নির্দিষ্টতা (গণচেতনার স্তর) আসে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযুক্তি ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যদিও এই সংযুক্তি-বিচ্ছিন্নতা দৈহিক-মানসিক-আত্মিক এই তিনটি মৌল ক্ষেত্রে দেখা যায়, তবুও এর নানান রূপ রয়েছে পারস্পরিক টানা-পোড়েনের ফলে। অতয়েব সংযুক্তির বহুমাত্রিক রূপ এবং সেই সাথেই বিচ্ছিন্নতার বহুমাত্রিক ধারা সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ চাই। গতানুগতিক সমাজ-বিশ্লেষণের ত্রুটি এখানেই যে শুধুমাত্র উৎপাদনের-সম্পর্কের ওপর এটি জোর দেয়। এর ফলে আমেরিকাকে ধনতান্ত্রিক ও রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে এটি বিচার সংকীর্ণতায় বৃদ্ধ হয়। গতানুগতিক ধারায় এটি লক্ষ্য করা হয়না যে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার শ্রমিকের মতো রুশ শ্রমিকেরও নেই। উৎপাদনের ধারা ও লক্ষ্য, পররাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে রুশ ও মার্কিনরাষ্ট্রের নীতি যেমন অভিন্ন, তেমনি ভোগবাদ, প্রজন্মের ব্যবধান, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে রুশ ও মার্কিন সাধারণ মানুষের চিন্তা ও কর্মপ্রণালী একই ধরণের। স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সমাজবিশ্লেষণের যৌক্তিকতা তাই আজ একান্ত প্রয়োজনীয়।

জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ, ও কায়িক শ্রম—সমাজের এই চারটি মৌলশক্তি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কতখানি কেন্দ্রীভূত (centralised) বা বিকেন্দ্রায়িত (decentralised) হয়ে পড়ছে এবং এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি-ধরণের, এ-দিকে নজর দিতে বলেছেন স্বামীজী। ভারতীয় সমাজে এর প্রয়োগ করা যাক।

প্রেস, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা মানুষের জনমত প্রভাবিত করে। যদিও সমাজের সামগ্রিক ছবি তুলে ধরা প্রেসের কর্তব্য, তবুও সাধারণভাবে তা না করে রাজনীতি ও শহুরে ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই দুটি ঘটনার মন্দ দিকগুলিই মূলত তুলে ধরা হয়, অর্থাৎ রাজনৈতিক অনাচার এবং শহরাঞ্চলের উত্তেজনামূলক সংবাদ প্রাধান্য পায়। কিন্তু সমাজ-সাংগঠনিক কাজকর্ম এবং গ্রামীণ সংবাদ মোটামুটিভাবে উপেক্ষিত হয়। ফলে পাঠকেরা অবিশ্বাসী মানসিকতার শিকার হয় এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী ধারণা কমে আসে। ব্যবসায়ীরা জনমত প্রভাবিত করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। বস্তুত ভোগ্যপণ্য যে আজ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে তার পেছনে বিজ্ঞাপনের বিরাট প্রভাব। রাজনৈতিক নেতারা তাদের ইউনিয়ান-জনসভা-ধর্মঘট এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। প্রেস-ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক নেতাদের জনমত তৈরীর প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় হল যে, যদিও ভোটের সময় মানুষ নিজস্ব মত জানাচ্ছে, তবুও দৈনন্দিন অধিকাংশ ব্যাপারে (রাজনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা, জিনিস কেনা, Cynic মানসিকতা ইত্যাদি) মানুষকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষা মানুষকে Carrerist করে তুলছে কিন্তু সামাজিক বা মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করছে না। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে expert ও Specialist তৈরী হচ্ছে অনেক কিন্তু কৃষ্টির (উন্নত সংস্কৃতি) প্রসার ঘটছে না। কৃষ্টিবিহীন উচ্চশিক্ষা সমাজে কি অনাচার নিয়ে আসছে তা সহজেই বোঝা যায় শিক্ষিতসমাজ বিশেষত ডাক্তার-উকিলদের পর্যবেক্ষণ করলে। এর ওপর সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষত

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালক নির্বাচনে আজ আর শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, বরং রাজনৈতিক সংযোগসূত্রই প্রাধান্য পাচ্ছে।

জ্ঞান বা বিদ্যাবুদ্ধি এভাবে যেমন কেন্দ্রীভূত হওয়ার দিকে ঝুঁকছে (জনমত তৈরীর মাধ্যমে এবং শিক্ষানীতির মাধ্যমে) অন্যদিকে তেমনি বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষণগুলিও দেখা যাচ্ছে। সাধারণ পাঠকেরা একাধিক দৈনিক পত্রিকা পড়ছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছেন, এবং ভোগ্যপণ্য কেনার আগে খোঁজখবর নিচ্ছেন—এ-সব ঘটনা উৎসাহ-জনক। অর্থাৎ প্রেস-ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে জনমত তৈরীর চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে এসবে পুরোপুরি প্রভাবিত না হয়ে নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার চেষ্টাও সাধারণ মানুষের মধ্যে চলছে। অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অল্প হলেও দ্বিমুখী প্রক্রিয়া চলছে।

শৌর্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটি প্রায় একমুখী। পুলিশ ও মাফিয়াদের মোকাবিলা করায় জনসাধারণ এখনও পিছিয়ে আছে। সার্বজনীন পুঁজার চাঁদা, বা জোরে তোলা আদায়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে টাকা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে জনসাধারণ এখনও অসহায়, গ্রামাঞ্চলে গরীবেরা ঠিকমতো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। ব্যক্তিমানুষ দলবেঁধে অন্যায়ের প্রতিরোধে বিশেষ অগ্রণী হচ্ছেনা যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু-কিছু গণপ্রহারের কথা শোনা যায়। রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনে পুলিশ ও মাফিয়া শৌর্যকে কেন্দ্রীভূত করে ফেলেছে। এই সাথেই লক্ষণীয় বিক্ষোভ ব্যাপক হলে পুলিশ পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে এর মোকাবিলায়, যেমন পাঞ্জাব-আসাম-মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা-হায়দ্রাবাদে। ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশই সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীকে ডাকতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্থের ব্যাপারে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, যদিও দারিদ্র্যসীমার নীচে লোকের হার কমছে (১৯০৯-৫০ সালে ৫৪'০৯, ১৯০৯-৫০ সালে ৫০'৮২, ১৯০৯-৫০ সালে ৪৮'৫) তবুও এই হিসেব শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য (ক্যালরীর হিসেবে) সংগ্রহকে ভিত্তি করে, বস্ত্র-বাসস্থান চিকিৎসার ব্যয় এতে বাদ দেওয়া হয়েছে! অর্থাৎ একজন লোক যদি ফুটপাতে থাকে, একটি মাত্র ধুতি পরনে থাকে এবং জ্বর হলে পয়সার অভাবে ওষুধ নাও কিনতে পারে, তবুও মাসে পঁচাত্তর টাকা খাবার জন্য খরচ করতে পারলেই সে আর দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকল না। এটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ভারতীয়দের

অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য কতটা ভয়াবহ।

দ্বিতীয়ত, ভারতে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা মোটামুটি ১৪ কোটি (২০%) অতিদরিদ্র ৩০ কোটি (৪১%), দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত ২২.৫ কোটি (৩৪%) এবং উচ্চবিত্ত ৩.৫ কোটি (৫%)।[৫] চাকরী, ব্যবসা ও রাজনীতির দৌলতে নিম্নবিত্তের একাংশ ক্রমশ উন্নত হয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে।

তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল কম পরিশ্রমে, অল্প সময়ে বেশি টাকা উপার্জনের মানসিকতা। অফিসে কারখানায় কাজ না করে ওভারটাইম-বোনাস ইত্যাদি দাবি করার কথা বাদই দিলাম, অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকে তাকালেও এটি বোঝা যায়। চিট্ ফাণ্ডে টাকা রাখার মানসিকতা যেমন বেড়েছে (সঞ্চয়িতার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তেরা), তেমনি লটারীর টিকিট কেনাও অনেকগুণ বেড়েছে (ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যসরকার তো বটেই, এমন-কি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরও এই ব্যাপারে বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ্যণীয়)। এই সাথেই দেখা দিয়েছে নতুন লক্ষণ—শেয়ার কেনা। একটি হিসেবে দেখা যায়, প্রাইভেট সেক্টার শিল্প-সংস্থাগুলি জনসাধারণের থেকে ক্রমশই বেশি পরিমাণে টাকা সংগ্রহ করতে পারছে—শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করে এই সংস্থাগুলি জনসাধারণের (বিশেষত কৃষক ও শহুরে মধ্যবিত্তদের) কাছ থেকে ১৯৫০-৫০ সালে সংগ্রহ করেছিল ৬৩ কোটি টাকা, ৭৯-৮০তে ৭০ কোটি, এবং পরবর্তী বছরগুলিতে যথাক্রমে ১১৩ কোটি, ৪২৩ কোটি ও ৯০০ কোটি টাকা।

চতুর্থত, কেউ-কেউ বলেন মধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। বাস্তব চিত্র কিন্তু বিপরীত কথাই বলে। পরিসংখ্যানের কথা বাদই দেওয়া হল, পাঠক যদি একবার তার নিজের পাড়া বেড়িয়ে আসেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে মধ্যবিত্ত ঘরে বিলাস দ্রব্যের ছড়াছড়ি। টাকার অবমূল্যায়নের যুক্তি দিয়ে কেউ যদি প্রকৃত বেতনের কথা তোলেন, তাহলে তার উত্তর হবে—তবে কি অন্য পথে মধ্যবিত্তের হাতে অতিরিক্ত টাকা আসছে? শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী এবং বহু মধ্যবিত্ত-পেশায় ঘুষের ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় মধ্যবিত্তের হাতে অতিরিক্ত টাকা সত্যিই আসছে।

পঞ্চমত, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দোষ দেবার সময় একটা কথা মনে রাখা দরকার যে শিল্পগুলির মোটা রকম শেয়ার কিনে রেখেছে সরকারী আর্থিক সংস্থাগুলি, যার মধ্যে আছে এল-আই-সি এবং ইউ-টি-আই (প্রথমটি

অর্থাৎ জীবনবীমা কর্পোরেশন এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ইউনিট ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া তাদের মূলধন জোগাড় করে প্রধানত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছ থেকে)। বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার হিসেব অনুযায়ী কয়েকটি বড় শিল্প-সংস্থায় সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার এ-ধরণের[৬] :—

কোম্পানী	অ্যাসেট্ (কোটি টাকায়)	সরকারের (শেয়ার শতকরা)
টিস্‌কো	৮৫০	৪২
টেলকো	৬০৫	৪৫
এ.সি.সি	৩৪১	৪৪
অশোক লেল্যাণ্ড	২৩৬	২৮
সিন্ধিয়া স্টিম্	২২৬	৩৫
ডি সি এম	১৮১	৪৩
গুজরাট ফার্টিলাইজার্স	১৭৯	৭৪
টাটা পাওয়ার	১৫৩	৩৮
লার্সেন অ্যাণ্ড টুব্রো	১৪২	৩৫
ভল্টাস্	১২৮	৪৬
মহীন্দ্র অ্যাণ্ড মহীন্দ্র	১২৭	৪৩
এস্কর্টস্	১০৫	৫৩
বোম্বে সাবার্বন ইলেকট্রিক সাপ্লাই	১০১	৭৫
কেশোরাম	৬৩	৩৯
কির্লোস্কার	৫৭	৩১

—বেসরকারী শিল্পসংস্থাগুলিতে সরকারী শেয়ার ৭০-এর দশকে ছিল প্রায় ৩২%, বর্তমান দশকে তা ইতিমধ্যেই ৪০%-এ দাঁড়িয়েছে। বড় শিল্পপতিদের মধ্যে একমাত্র বিড়লা পরিবারই নিজেদের কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার নিজেদের হাতে রাখে। গোয়ালিয়র রেয়নের ৫৯% শেয়ার বিড়লার হাতে, যেখানে কামানি ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে আর পি. গোয়েঙ্কার শেয়ার ১০%, ন্যাশনাল রেয়নে বিজয় বালিয়ার হাতে ১৬%. স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাটারীতে চার-পরিবারের হাতে ১৭%, ইণ্ডিয়ান রেয়নে আদিত্য বিড়লার হাতে ১৬%

শেয়ার।[৭] বড় শিল্পসংস্থাগুলিতে যেভাবে সরকারী শেয়ারের হার বেড়ে চলেছে তাতে সমাজতন্ত্রের কথা বাদই দিলাম, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে বোর্ড-সভায় ভোটের পথেই এগুলিকে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে বর্তমান সংবিধান বজায় রেখেই সরকার এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক এসকর্ট কোম্পানীর ঘটনা উল্লেখ্য। সুপ্রিম কোর্ট তো এ ব্যাপারে জীবনবীমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ· ধনী চাষী, এবং ব্যবসায়ী—এই তিনের আঁতাত ভারতে শোষক-গোষ্ঠী। এরা মধ্যবিত্তদের ব্যাপক অংশকে হাতে রেখে শোষণ চালাচ্ছে এবং জাতীয় মানসিকতার অর্থনীতিবাদকে প্রতিষ্ঠা করছে।

শ্রমের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, বাঁচবার জন্ত গরীবদের অধিক শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, কিন্তু অধিক শ্রম-সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ প্রকল্পগুলি, মহারাষ্ট্রের চাকরী সংরক্ষণ ও রাজস্থানের অন্ত্যোদয় প্রকল্প গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জন্ত শ্রম-সংস্থানের বেশ কিছুটা ব্যবস্থা করলেও অধিকাংশ রাজ্য-সরকারই (কংগ্রেস, জনতা, সি পি এম ও অন্যান্য) এ বিষয়ে রীতিমত ব্যর্থ।

ভারতে প্রতি বছর ৫০ লক্ষ নতুন লোক শ্রমশক্তি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে, যারা জীবন-ধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় কাজ পাচ্ছে না। অথচ সরকারী অফিস ও উৎপাদন-সংস্থাগুলিতে কর্মে নিযুক্ত লোকেরা শ্রমের অপচয় ঘটাচ্ছে প্রয়োজনীয় কাজ না করে। এভাবে জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবিক ও আর্থিক পুঁজির অপব্যয় ঘটছে এবং পরিণতিতে অধিক কাজের সুযোগ তৈরী হচ্ছে না।

এই শতাব্দীতে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা গেলেও সামাজিক কর্মবিন্যাসে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। নীচের তালিকায় তা পরিষ্কার।[৮]

বছর	কৃষি-পশুপালন ইত্যাদি প্রাথমিক কাজে নিযুক্ত মানুষ	শিল্পে নিযুক্ত মানুষ	বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ইত্যাদিতে নিযুক্ত মানুষ
১৯০১	৭১·৮%	১২·৬%	১৫·৬%
১৯৬১	৭২·২%	১১·৭%	১৬%

পর্দার আড়ালে শক্তিবিন্যাস

ওপরের আলোচনায় প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির সাথে জনসাধারণের, বিশেষত শূদ্রশ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের কয়েকটি দিক আলোচনা করা হল। এই আলোচনার আরেকটু বিস্তৃতি ঘটনা যাক। এ প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় কিনা দ্রষ্টব্য। প্রথমত, প্রভাবশালী গোষ্ঠিগুলির সাথে শূদ্রশ্রেণীর সম্পর্কের টানা-পোড়েন কতটা? দ্বিতীয়ত, এসব গোষ্ঠির ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা কি নির্ধারিত হচ্ছে শূদ্রশ্রেণীর আওতার বাইরে?

রাজনৈতিক নেতারা শূদ্রদের ওপর নির্ভর করে ভোটের জন্য যেহেতু বর্তমান সমাজে চারটি শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) মধ্যে শূদ্রেরাই সংখ্যারিষ্ঠ। "শূদ্র" বলতে এখানে হিন্দুধর্মের কোন জাতিবর্ণ বোঝানো হচ্ছে-না, বিবেকানন্দের মতে যারা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তারাই শূদ্র। কোন্-কোন্ পেশার লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভু'ক্ত তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ধনী চাষীরা শূদ্রদের ওপর নির্ভর করে শ্রমের জন্য। আর উৎপাদনের জন্য শূদ্রদের ওপর নির্ভর করে ব্যবসায়ীরা। অবশ্য রাজনৈতিক নেতা ও ধনী চাষী যেমন সরাসরি নির্ভর করে শূদ্রের ওপর, ব্যবসায়ীরা ততটা সরাসরি না হলেও উল্লেখযোগ্যভাবেই তাদের ওপর নির্ভরশীল। শূদ্রেরা পাট-আখ-ধান-গম উৎপাদনে রাজি না হলে ধনী চাষী যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যবসা করার পণ্যের অভাবে। শিল্পে ধর্মঘট হলে শিল্পপতিরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যবসায়ীরাও (ডিলার এজেন্ট প্রভৃতি) তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসাথেই লক্ষ্যণীয়, ধনী চাষী ও শিল্পপতিদের মধ্যে সংঘর্ষের সম্পর্ক আছে। প্রথমত, সরকার কোন্ ক্ষেত্রে বেশি টাকা নিয়োগ করবে ও সুযোগ-সুবিধা দেবে, এই প্রসঙ্গে ধনী চাষী ও শিল্পপতিরা পরস্পর-বিরোধী শিবিরে। দ্বিতীয়ত, কৃষি-পণ্যের দাম বাড়লে ধনী চাষীদের লাভ হয় কিন্তু এর ফলে পণ্যমূল্যসূচক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতা বাড়ে, অথবা শেষপর্যন্ত ধর্মঘট হয় মাইনে বাড়ানোর জন্য যেটা শিল্পপতিদের আঘাত করে। তৃতীয়ত, শিল্পে মজুরীবৃদ্ধি হলে শিল্পপতিরা জিনিসের দাম বাড়ায়। এর ফলে সার-ওষুধ-কৃষিযন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হলে ধনী চাষীর ওপর নতুন বোঝা চাপে। তাছাড়া, শিল্পে নতুন নতুন কৃত্রিম পণ্য উৎপাদিত হবার সাথে-সাথে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। সিন্থেটিক কাপড় ও কৃত্রিম পাটের উৎপাদন কৃষিক্ষে

তুলা ও পাটের বাজারে বেশ কিছুটা আঘাত হেনেছে। এভাবে ধনী চাষী ও শিল্পপতিদের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হলেও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে উভয়েরই মধুর সম্পর্ক।

সুতরাং এটা পরিষ্কার ধনী চাষী-ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক নেতা যথাক্রমে শূদ্রদের শ্রম-উৎপাদন-ভোটের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অন্যান্য প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলি—আমলা-সংবাদ মাধ্যম-পুলিশ-মাফিয়া-কেরাণী—ততটা শূদ্রদের ওপর নির্ভরশীল নয়। কৃষি ও শিল্পে শূদ্রদের ধর্মঘট এই পাঁচটি গোষ্ঠীকে আঘাত করে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমলা-সাংবাদিক-পুলিশ-কেরাণী নিজেদের প্রভাবে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ও অন্যান্য উপায়ে নিজস্ব আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে নেয়, মধ্যবিত্ত প্রসঙ্গে এ-বিষয়টি আমরা আগেই দেখেছি। তাছাড়া রেশনিং-ব্যবস্থায় এরা সরকার থেকেই চাল-ডাল-গম-চিনি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সুবিধাজনক দামে পায়। মাফিয়া গোষ্ঠী যেহেতু রাজনৈতিক নেতা-পুলিশ-ব্যবসায়ীদের এবং গ্রামে ধনী চাষীদের সঙ্গে আঁতাত করে সেজন্য শূদ্রদের ওপর মাফিয়ারাও তেমনভাবে নির্ভরশীল নয়।

এবারে শূদ্রদের দিক বিচার করা যাক। এরা ধনী চাষীর ওপর নির্ভরশীল এবং ভারতের গ্রামাঞ্চলে রেশনিং-ব্যবস্থা খুবই কম বলে ব্যবসায়ীদের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অধিক মজুরী, জমি পাওয়া, খরা ও বন্যা ইত্যাদি ব্যাপারে শূদ্রেরা এখন পর্যন্ত সংগ্রাম করছে রাজনৈতিক নেতাদের অধীনে, ফলে এই নেতাদের ওপর তারা নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। আমলা-পুলিশ-কেরাণী সরকারী ব্যবস্থার অঙ্গ বলে এদের ওপরও শূদ্রদের নির্ভরতা রয়েছে, বিশেষত সরকারী সাহায্য নানাভাবে শূদ্রদের প্রয়োজন হয়। শুধু প্রেস ও মাফিয়াদের ওপর ভারতের শূদ্রেরা এখন নির্ভরশীল নয়, যদিও মাফিয়াদের অত্যাচার সহ্য করতে হয় এদের।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ধনী চাষী-ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক নেতাদের সাথে শূদ্রদের সম্পর্ক উভয়মুখী, শূদ্ররা যেমন এদের ওপর নির্ভর করে, এরাও তেমনি নির্ভর করে শূদ্রদের ওপর। কিন্তু আমলা-পুলিশ-কেরাণীর সাথে শূদ্রদের সম্পর্ক একমুখী। শূদ্রেরা এদের ওপর নির্ভর করলেও এরা সে-রকম প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল নয় শূদ্রদের ওপর।

এবারে আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়া যাক। সমাজের মূল রাজনৈতিক শক্তি, অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতা-ধনী চাষী-ব্যবসায়ী শূদ্রদের ওপর

নির্ভরশীল ভোট-উৎপাদন-শ্রমের জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কারণেই কি এই তিনটি গোষ্ঠীর আঁতাত হয়েছে? অর্থাৎ তিন গোষ্ঠীর জোটবদ্ধ হওয়ার integrating factor কি শূদ্রশ্রেণী অথবা এই তিন গোষ্ঠীর ক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়াস চলছে এমন এক স্তরে যা শূদ্রশ্রেণীর হাতের বাইরে? প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যই শূদ্রেরা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রয়োজনীয়। কারণ নির্বাচনে ভোট পাবার ওপরই নেতাদের অস্তিত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে। আবার শূদ্রেরা রাজনৈতিক নেতাদের কাজে লাগায় নিজেদের দাবি ও আন্দোলনের সময়। অর্থাৎ নেতাদের কাছে শূদ্রদের প্রয়োজনীয়তা শুধু ভোটের সময় হলেও শূদ্রদের কাছে নেতার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন সময়ে এবং এর ফলে ভোট যখন থাকেনা তখনও নেতারা শূদ্রদের সাহায্য করে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য। কিন্তু নেতা ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক আরও নিবিড়। ব্যবসা সারা বছর ধরেই চলে, এতে কালো টাকার বিরাট খেলা থাকে এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে যে-কোন সময় সংসদে ব্যবসায়ী-বিরোধী বিল পাশ বা অর্ডিন্যান্স জারী হতে পারে, সেজন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে সবসময়ই রাজনৈতিক সমর্থন দরকার। বিপরীতদিকে শুধু ভোটের সময়ই নয়, সারা বছরই দলের নানারকম কাজে, আন্দোলন পরিচালনায়, কর্মী ও নেতাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাজনৈতিক নেতাদের দরকার হয় নিরবচ্ছিন্ন অর্থ সরবরাহ। এবং এই প্রয়োজনীয় অর্থের নিরবচ্ছিন্ন যোগানের প্রধান দায়িত্ব নেয় ব্যবসায়ীরা।

প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির সমস্যা ও দ্বন্দ্ব

অধিকাংশ প্রভাবশালী গোষ্ঠীই যে শূদ্রদের ওপর নির্ভরশীল নয় সে কথা আলোচনা করেছি। এরা নিজস্ব স্থিতি বজায় রাখছে সমগ্র সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়, বরং কয়েকটি মাত্র সামাজিক-প্রশাসনিক উপাদানকে আশ্রয় করে। কিন্তু এভাবে এরা কতটা সফল হচ্ছে? কেননা এদের লক্ষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রকৃত লক্ষ্য ও গৌণ লক্ষ্যের পার্থক্যও যথেষ্ট। পরপৃষ্ঠার ছকের সাহায্যে এদের প্রধান লক্ষ্য ও গৌণ লক্ষ্যের দিকে দেখা যাক।

গোষ্ঠী	প্রধান লক্ষ্য	গৌণ লক্ষ্য
আমলা	প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রাখা	সরকারী নীতিকে ব্যবহারিক করা
সংবাদ জগৎ	গণতন্ত্রকে রক্ষা করা	জনমত তৈরী
পুলিশ	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা	সরকারী ব্যবস্থা প্রয়োগ
মাফিয়া-সমাজবিরোধী	টাকা জোগাড়—জবরদস্তিভাবে	রাজনৈতিক নেতার ও পুলিশী আশ্রয়
ব্যবসায়ী	মুনাফা (কাটকা পথে)	পণ্যের ওপর অধিকার
রাজনৈতিক নেতা	গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের সমর্থনলাভ	ক্ষমতাকেন্দ্র দখল
ধনী চাষী	অধিক উৎপাদন	মুনাফা
কেরাণী	আমলাদের সাহায্য করা	মধ্যবিত্তসুলভ জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন

গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল আসে, কিন্তু প্রশাসনিক ও পুলিশ ব্যবস্থা দুটির স্থায়িত্ব কাঠামো বজায় থাকে। এবং উভয়ের মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার নিরপেক্ষভাবে সরকারী নীতিকে প্রয়োগ করা। কিন্তু সমস্যা হল, সরকার যেহেতু দলীয় সরকার সেহেতু শেষবিচারে ও বাস্তবে এই উভয় গোষ্ঠী শাসক দলের তল্পিবাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বর্তমান ভারতে আমলা ও পুলিশের কাছে প্রধান লক্ষ্যের চেয়ে গৌণ লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে, এবং গৌণ লক্ষ্যও সরকারীনীতির বদলে সরকারে আসীন দলের নীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ এদের কাছে নিরপেক্ষ ব্যবহার পাচ্ছে না। এবং এটিই আবার এই দুই গোষ্ঠীর কাছে অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব নিয়ে আসছে। এদের পদোন্নতি নির্ভর করে সরকারের ওপর সেহেতু শাসক পক্ষের দলীয় রাজনীতিতে এদের জড়িয়ে পড়তে হয় এবং সরকার বদলের ফলে পদোন্নতি ব্যাহত হয়।

সংবাদ জগতের ক্ষেত্রেও গৌণ লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠছে, অর্থাৎ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে এরাও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জনমত তৈরী করছে অনেকটা নিজেদের অজান্তেই। অবশ্য সংবাদপত্র বলতে এখানে স্বাধীন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির কথাই বলছি, রাজনৈতিক দলের সমর্থক পত্রিকাগুলির কথা বলছি না। এগুলির অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব কি-রকম? আগেই দেখেছি এর মূল নির্ভরতা মধ্যবিত্ত পাঠক সম্প্রদায় এবং বন্ধু হিসেবে কাজ করছে ব্যবসায়ীরা। পাঠকদের দিকে তাকিয়ে তারা স্থানীয় সংবাদের ওপর বেশি জোর দেয়, ফলে সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় সংবাদ কম থাকে, বিশ্ব-সংবাদ তো আরও কম। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন যে ধারা পত্রিকাগুলিকে প্রভাবিত করেছে—অর্থাৎ রাজনৈতিক সংবাদে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ—তা থেকে আজও মুক্ত না হওয়ায় পত্রিকাগুলি দেশের সামাজিক চিত্র বা অবস্থা তুলে ধরতে পারছে না। অথচ গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি নিহিত সামাজিক অবস্থায়, রাজনীতি তার একটি দিক তুলে ধরে শুধু। আস্তলে বা ময়লি-টেপ্ আসলে সামাজিক অবস্থারই ছোট্ট প্রতিফলন মাত্র।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যেন-তেন-প্রকারেণ অতিরিক্ত উপার্জনে আগ্রহী এবং এর জন্য আয়কর দিতে রাজি নয় (শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী, কেরাণীদের ঘুষ নেওয়া ইত্যাদি)—এরই রাজনৈতিক প্রতীক কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের পতন, কাশ্মীরে শাহ'র দল ভারী হওয়া ইত্যাদি। কাট্‌কা খেলার রোগ শুধু

ব্যবসায়ীদেরই নয়, সঞ্চয়িতায় টাকা রাখা কিংবা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সংস্থার লটারী খেলা চালু হওয়া দেশের সামাজিক চিত্রকেই তুলে ধরে। সংবাদপত্র-গুলি বিভিন্ন সমস্যায় বারবার রাজনীতিকে তুলে ধরছে, ফলে সাধারণ পাঠকও মনে করছে নির্বাচনে দল-বদল করলেই বুঝি সমস্যা মিটবে। সমস্যার মূল যে আরও গভীরে—সমাজ-মানসিকতায়, সে বিষয় এভাবেই বারবার এড়িয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত পাঠকদের ওপর নির্ভরতা ছাড়াও ব্যবসায়ীরা বড় ভূমিকা নেয় বিজ্ঞাপন দিয়ে। অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন মানেই কম সংবাদ। ফলে জায়গার অভাবে উপেক্ষিত হয় গ্রামীণ সংবাদ অথচ গ্রামকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়না। বিহারের গ্রামগুলির ভয়াবহ দারিদ্র্য খবরের কাগজে বেরই হয়না, অথচ দিল্লীর ঝুপড়িবাসী মানুষের অবস্থা এদের চেয়ে অনেক ভাল হওয়া সত্বেও সংবাদপত্রে স্থান পায়। আসলে গণতন্ত্রের ভিত্তি শহর নয়, গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ; রাজনীতি মূলত সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন। এই বিষয়গুলি সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছে না জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি উল্লিখিত কারণে। এবং এভাবেই গৌণ লক্ষ্য প্রধান হয়ে উঠছে এবং অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব নিয়ে আসছে।

সমাজবিরোধী গোষ্ঠীগুলির প্রধান লক্ষ্য ও গৌণ লক্ষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলেও অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব এদের মধ্যে আছে। এদের এক-এক দল এক-এক ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতার অধীনে থাকায় নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে নামে প্রভুর নির্দেশে। কারণ এক প্রভু অন্য প্রভুর বিরুদ্ধে প্রধানত এদেরই ব্যবহার করে।

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য ও গৌণ লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকলেও অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব আছে। সরকার ও বিভিন্ন দলের রাজ-নৈতিক নেতাদের হাতে রাখার জন্য ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত অর্থ ব্যয় এবং প্রভাব খাটাতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও প্রশাসনিক কাঠামোর আমলা এবং পুলিশ, ও সেই সাথে গণমাধ্যম প্রেস, সহযোগী ধনী চাষী, এবং নিজস্ব রক্ষীবাহিনী মাফিয়া তথা সমাজবিরোধী—এতগুলি গোষ্ঠির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয় ব্যবসায়ীদের। এতগুলি দিককে "নরম" রাখতে গিয়ে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয় এরা—প্রথমত ব্যবসায় লাভের অঙ্ক উঁচু রাখতে হয় যাতে উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলিকে "পুজো" দিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে এবং দ্বিতীয়ত ঐ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সম্পর্কের টানা-পোড়েন থাকায় তা ব্যবসায়ীদেরও ধাক্কা দেয়।

ব্যবসায়ীরা নির্ভর করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্রয়ক্ষমতা ও শূদ্রদের উৎপাদনের ওপর। এই দুই গোষ্ঠীকে শোষণের মাধ্যমেই এদের মুনাফা বাড়ে, আবার ব্যবসায়ীদের "পুজো-পাওয়া" গোষ্ঠীগুলির অধিকাংশ নিজেদের স্থায়িত্বের জন্যই অনেকাংশে মধ্যবিত্ত ও শূদ্রদের পাশে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব এখানেই।

রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে কিন্তু গৌণ লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। ক্ষমতালাভ—তা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে হোক, জেলায় হোক, কি রাজ্যে বা কেন্দ্রে হোক—প্রধান লক্ষ্য হয়ে যাওয়ায় গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের সমর্থন পাবার লক্ষ্য অনেক সময় গৌণ হয়ে যায়। ধনী চাষী, বর্গাদার ও ক্ষেত মজুর প্রসঙ্গে এই নেতাদের ভূমিকা আগেই দেখেছি। সর্বভারতীয় দলগুলি কোন সমস্যায় সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। এবারে রাজনৈতিক নেতাদের অস্তিত্বগত দ্বন্দ্বের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। এরা নিজেদের স্বার্থেই জনসাধারণকে রাজনীতিভুক্ত করতে চায়, কিন্তু জনসাধারণ যতই রাজনীতি সচেতন হচ্ছে অস্থির ভোটারের সংখ্যা ততই বাড়ছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরী হিসেব করে দেখিয়েছেন ১৯৬৭ সালের পর যত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিতে পর পর দুটি নির্বাচনে জিতেছেন এমন প্রার্থী সমগ্র বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, অর্থাৎ ৬৭% বিধানসভা-সদস্যই পরবর্তী নির্বাচনে জিততে পারেনি গত সতেরো বছরে।[৭] অর্থাৎ শহরের মতো গ্রামেও অনিশ্চিত ভোটার দ্রুতবেগে বাড়ছে।

ধনী চাষীর প্রধান লক্ষ্য উৎপাদনবৃদ্ধি—এটি হচ্ছে স্বাধীনতার পরে উন্নতপন্থায় চাষবাসের সুযোগ পেয়ে। পরাধীন ভারতে মুনাফাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এ-সত্ত্বেও মুনাফা আজ প্রধান লক্ষ্য থেকে বিশেষ সরে যায়নি। বিশেষত ব্যবসায়ীরা অধিক ফসল কম দামে কিনে কিছুদিন আটকে রেখে বিক্রী করায় বেশি লাভ হচ্ছে এটি আবিষ্কার করার পর ধনীচাষীরাও এদিকে নজর দিল। ধনী চাষীর অস্তিত্বগত মূল দ্বন্দ্ব শিল্পপতিদের সঙ্গে। কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে যেমন আঘাত করে তেমনি শিল্পেও ব্যয়বৃদ্ধি ঘটায়, প্রথমত পাট-আখ ইত্যাদি কাঁচামালের জন্য এবং দ্বিতীয়ত শ্রমিকদের মজুরী-বৃদ্ধিতে। ফলে শিল্প পণ্যের দাম বাড়ে এবং সার-ওষুধ-কৃষি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দাম বৃদ্ধি ধনী চাষীর ওপরও আঘাত হানে। তাছাড়া ছোট চাষী, বর্গাদার, ক্ষেতমজুরের শ্রমের ওপর ধনী চাষী নির্ভরশীল। এদের মজুরী না

বাড়ালে আশানুরূপ শ্রম পাওয়া যায়না এবং এদের আন্দোলনে তাদের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওদিকে রাজনৈতিক নেতা ও দলের তহবিলে নিয়মিত মোটা টাকা দেওয়াও আছে। তাই শিল্পপতির সাথে দ্বন্দ্ব থেকেই যায়—ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতার সাথে আঁতাতে ছোটচাষী-বর্গাদার-ক্ষেত-মজুরদের দমন করেও।

কেরাণীদের ক্ষেত্রে অবশ্য গৌণ লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। এদের অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব রয়েছে এদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই। পণ্য মূল্য বৃদ্ধি হলে এরা বর্ধিত বেতনের জন্য দাবি করে অথচ বেতন বাড়লে সেই টাকা বিলাস পণ্য কিনতে খরচ করে।

গণচেতনার দিক

বর্তমান ভারতীয় সমাজে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলি কি কি, এদের অস্তিত্ব বিষয়ক দিক ও পারস্পরিক টানা-পোড়েন, গরিষ্ঠসংখ্যক শূদ্রশ্রেণীর সাথে এদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ক প্রসঙ্গগুলি আমরা আলোচনা করেছি। জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও শ্রম—সামাজিক যৌনশক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গণচেতনার—বিশেষত শূদ্রশ্রেণীর চেতনার—প্রকৃতি নিয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যা ফুটিয়ে তুলবে এদের চেতনার স্তরের ধরণটি।

১। **শূদ্রশ্রেণীর ঐক্য বিষয়েঃ** শূদ্রদের সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ না হতে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। ভূমিহীনদের জমি দেওয়া হলেও তারা যাতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় প্রথায় চাষ করতে পারে তার উদ্যোগ নিচ্ছেনা কোন্ সরকার বা রাজনৈতিক দল। বেসরকারী রুগ্ন শিল্প জাতীয়করণ করা হচ্ছে, সরকারী রুগ্ন শিল্প, শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন শিল্প সম্পূর্ণরূপে শ্রমিক পরিচালনায় দেবার পরীক্ষা হচ্ছে না।

২। **সামাজিক সংগঠন প্রসঙ্গেঃ** অ-রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ওপর আঘাত আসছে। প্রেস ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, সমাজসেবী যে চেষ্টা করছেন মানুষের উন্নতির জন্য সেই প্রচেষ্টার নানারকম বিধি-নিষেধ

চাপানো হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে অ-রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখে রাজনৈতিক দলগুলি এবং নানাভাবে সেগুলির কাজে বিঘ্ন ঘটানো হয়।

৩। **রাজনৈতিক ঐক্য সম্পর্কে:** বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করছে ধনী চাষী-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে। অতএব রাজনৈতিক নেতা-ধনী চাষী-ব্যবসায়ীর এই আঁতাতকে কোন-না-কোনভাবে স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে রাজনৈতিক ঐক্য প্রসঙ্গে। এজন্য শূদ্রশ্রেণী নিজের শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠছে না।

৪। **রাজনীতি প্রসঙ্গে:** শহরাঞ্চলের মানুষ তো বটেই, এমন কি গ্রামাঞ্চলের মানুষও ক্রমশই রাজনীতির ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে উঠছে। গ্রামীণ শূদ্রশ্রেণী ভোটের ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি স্বাধীন চেতনার পরিচয় দিচ্ছে, কেরাণীরা রাজনৈতিক নেতাদের কাজে লাগাচ্ছে দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে। কিন্তু অন্য সময়ে এই নেতাদের নেতৃত্ব মেনে না নিয়ে স্বাধীন-ভাবে থাকছে। ছাত্ররা দ্রুতহারে রাজনীতি সম্পর্কে অনাগ্রহী ও সন্দেহগ্রস্ত হয়ে উঠছে, শিক্ষিত সৎ সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা রাজনীতির আঙ্গিনায় আর আসতে চাইছেন না।

৫। **বিক্ষোভ-প্রকাশ প্রশ্নে:** সাধারণ মানুষ কোন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নিজে-নিজে এগিয়ে আসছে না, নেতা পেলে এরা বিক্ষোভে সাড়া দেয়, নাহলে চুপ করে থাকে। সাধারণ মানুষেরা যেমন নেতার অভাবে প্রায় অসহায় কিন্তু নেতা পেলে সংগ্রামী ঐক্য দেখায়, তেমনি নেতা-বেছে নেওয়ার মধ্যেও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—সৎ ও আদর্শপ্রাণ, হলে তবেই নেতা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ও দ্রুত আকৃষ্ট করতে পারছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতারা সম্মিলিত-ভাবে যে কাজ করতে পারেননি, জয়প্রকাশ একাই তা করেছিলেন।

চার ঃ রাষ্ট্র ও মানুষ

একটি সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে রাষ্ট্র হল এমন একটি সংস্থা, যার উপস্থিতি সেই সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে কম-বেশি প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। অসামরিক প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী এবং সেই সাথে বৈষয়িক উপকরণগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র তার ক্ষমতাকে ধরে রাখে। জনসাধারণ এর বৈধতা স্বীকার করে বা করতে বাধ্য হয়, রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নিজেদের পরিচালিত করে। স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, সমাজের পরিচালিকা শক্তি সবসময় যে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সরাসরি শাসন চালায় তা নয় বরং অনেক সময়ই তার প্রয়োগ দেখা যায় পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ জনসাধারণ মূল পরিচালিকা শক্তির মুখোমুখি যে সবসময়ই হবে এমন নয়, জনসাধারণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ রাষ্ট্রের। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শাসনের যুগে ব্রাহ্মণেরা সরাসরি রাষ্ট্র-পরিচালনা না করে ক্ষত্রিয়দের মাধ্যমে তা করতেন। মূল পরিচালিকা শক্তি ব্রাহ্মণ হলেও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ থাকত রাজার। আবার বর্তমানের বৈশ্যশাসনের দেশগুলিতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সরাসরি রাষ্ট্রকে শাসন না করে রাষ্ট্রকে সহযোগী করে তোলে প্রভাববিস্তার করে। সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্র। অন্যান্য সংগঠনের সাথে এর সরাসরি সংস্পর্শ আছে, যা সমাজের অন্য কোন সংগঠনের ক্ষেত্রে হয় না।

বিবেকানন্দের মতে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে প্রথমদিকে শক্তি এবং পরে চুক্তি কাজ করেছিল। অসামরিক প্রশাসন, সামরিক ব্যবস্থা, এবং অন্যান্য বৈষয়িক উপাদানের ক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রই কতগুলি সাধারণ রীতি-পদ্ধতির আশ্রয় নিলেও রাষ্ট্র-চরিত্রে পার্থক্য দেখা যায় এবং এর ফলে নানা ধরণের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দেখা মেলে। মানুষ মেনে নিয়েছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অথচ এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই মানুষের বারবার বিদ্রোহ কেন? প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণশাসন থেকে বর্তমান রাশিয়ার শূদ্রশাসন পর্যন্ত যে বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্র দেখা গেছে, তার সব কটিই গঠিত হয়েছে জনসাধারণের সহায়তায় অথচ সেই জনসাধারণই এই রাষ্ট্রগুলিকে বদলাবার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে এই টানা-পোড়েন কেন চলে এবং কিভাবেই বা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করার চেষ্টা

হয় এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করলে দেখতে পাব যে গতানুগতিক চিন্তার সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

রাষ্ট্র ও জনসাধারণ

"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল, রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষনে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে।"[১]

উপরোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে বিবেকানন্দ তিনটি বিষয় তুলে ধরেছেন। প্রথমত, রাষ্ট্রের নিজস্ব সাংগঠনিক উপাদান থাকলেও মূলত তা জনসাধারণের ওপরই নির্ভরশীল। এমন কি পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে সরিয়ে নিজস্ব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সময় বিভিন্ন শ্রেণী-সংগঠন সংগ্রাম করে জনসাধারণের সাহায্যেই। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের সাহায্যে নিজস্ব নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করলে বা জন-সাধারণের ওপর নির্ভর করলেও রাষ্ট্র ক্রমে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, পুরনো রাষ্ট্র পরিবর্তনের সময় জনসাধারণ সংগ্রাম করে কোন শ্রেণী-নেতৃত্বের পতাকাতলে।

বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্রশাসনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য,

ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য এবং বৈশ্যের ধনসম্পদ সম্ভব হয় শূদ্রদের পরিশ্রমেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল শূদ্রদেরই পরিশ্রমে, অথচ শূদ্রেরা তাদের পরিশ্রমের ফল বা পুরস্কার কখনও পায়নি। বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে কালক্রমে শূদ্রশাসন দেখা দেবে পৃথিবীতে। এবং এই সাথেই বলেছেন, শূদ্রশাসিত রাষ্ট্রও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শাসিত রাষ্ট্রগুলির মতো ব্যবহার করবে জনসাধারণের সাথে; অর্থাৎ পূর্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির মতো শূদ্রশাসনও জনসাধারণের ওপর নির্ভর করবে, কিন্তু জনগণ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য জনসাধারণের বিকাশে সাহায্য করা, সমাজের মৌল পরিচালিকা শক্তিগুলিকে বিকেন্দ্রায়িত করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিচালক শ্রেণী এই শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে স্বীয় স্বার্থে—ব্রাহ্মণ করে জ্ঞানকে, ক্ষত্রিয় অস্ত্রকে, বৈশ্য অর্থকে এবং শূদ্র শ্রমকে। ফলে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বাধার সৃষ্টি হয়। যেহেতু মুক্তিই মানবজাতির সর্বপ্রধান চাহিদা সেহেতু মানুষ এই কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্র নিজের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে চায়, আর জনসাধারণ তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায়। এই টানা-পোড়েন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর ফলেই দেখা দেয় রাষ্ট্রশক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ। বিবেকানন্দের ভাষায়—"সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপর সমাজে প্রাণ বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।"[২] "পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান্ অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান্, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"[৩]

ব্রাহ্মণশাসনে (priest rule) পরিচালিকা শক্তি জ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে স্বাধীনতা দেন নি, মধ্যযুগীয় ইওরোপেও খৃষ্টান চার্চ অ-ধর্মীয় (secular) শিক্ষাকে উৎসাহ দিত না এবং বাইবেলের বিরোধী মত প্রকাশ করলে বিজ্ঞানীদের ওপর অত্যাচার চালাত। আধুনিককালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মোল্লাতন্ত্রেও একই অবস্থা।

ক্ষত্রিয়শাসনে রাজ্যের কর-ব্যবস্থা (tax) এবং প্রশাসনে মানুষের কোন :মতামত নেওয়া হত না। বরং জনসাধারণের প্রদত্ত করের অধিকাংশই খরচ করা হত রাজাদের বিলাস ও রাজ-আমাত্যদের পুষ্টির জন্ত। এই শাসনে রাষ্ট্রের হাতে অস্ত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত হয় পার্থিব ঐশ্বর্যও।

বৈশ্যশাসনে কেন্দ্রীভূত হয়, অর্থ নৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদ এবং শূদ্রশাসনে ঘটে শ্রমের কেন্দ্রীকরণ।

এই যে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ যার ফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রশক্তি থেকে, এটি সব শাসনেরই সাধারণ লক্ষন হলেও এই বিচ্ছিন্নতার রূপে বৈচিত্র্য আছে। এ-প্রসঙ্গে কতগুলি বিষয় আলোচনা করে আমরা দেখব প্রতিটি শাসনে কিভাবে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রশক্তির পতনই বা ঘটে কিভাবে ?

জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতা

প্রথমেই যে প্রশ্নটা ওঠে সেটা হল, জনসাধারণ কি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বোধ করছে ? প্রাথমিকভাবে এই বোধ আসে সমাজ সম্পর্কে। মানুষের দুটি সত্তা—সামাজিক এবং ব্যৈক্তিক এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব এই দুটির মধ্যে যদি সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয় তখনই সে পড়ে সংকটে। মানুষের সামাজিক সত্তা যদি তার ব্যক্তি-সত্তার বিরুদ্ধে যায় তাহলে এই সংকট গভীর হয়। আর এই সংকট যখন বহু মানুষের মনে দেখা দেয় তখনই দেখা দেয় সামাজিক সংকট। মানুষের সামাজিক সত্তা গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করে সমাজের প্রতি তার আত্মীয়তাবোধ, একাত্মবোধ। এই একাত্মবোধ বিঘ্নিত হলেই মানুষ বিচ্ছিন্নতার কবলে পড়ে। রাষ্ট্র হল সমাজের একটি অংশ। এর সাথে মানুষ যদি একাত্মবোধ না করে, তবে সে মানসিক দিক দিয়ে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতাকে সে সামাল দিতে পারে সমাজের অন্ত কোন অংশের প্রতি একাত্মবোধ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে বেশ কিছু সময়ে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের সাথে একাত্মবোধ করেনি ; এক রাজার বদলে অন্ত রাজা এসেছে, কিন্তু মানুষ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ সমাজের অন্ত কোন অংশের প্রতি তাদের একাত্মবোধ ছিল। অথবা বলা যায় যে তাদের সামাজিক সত্তায় রাষ্ট্রের প্রভাব ছিল পরোক্ষ বা গৌণ।

কিন্তু রাষ্ট্র থেকে যখন মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবছে এবং এই বিচ্ছিন্নতা

তার জীবন সংকট নিয়ে আসছে, তখন বুঝতে হবে রাষ্ট্র তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এবং তা বুঝতে হলে দেখতে হবে মানুষের দৈহিক ও মানসিক অস্তিত্বের ওপর রাষ্ট্র কতখানি নিয়ন্ত্রণ কিভাবে আরোপ করছে, যার ফলে মানুষ রাষ্ট্রকে তার অস্তিত্বের পক্ষে একটা বিপরীত শক্তি বলে মনে করছে এবং নিজস্ব সক্রিয়তায় মানুষ সমাজের কোন্ দিকটিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে? সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে মানুষের যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তা মানুষকে কোন্ পথে ঠেলে দিচ্ছে, এটিও দেখা দরকার।

মানুষের এই বিচ্ছিন্নতাকে বিবেকানন্দ দুটি দিক থেকে আলোচনা করেছেন। প্রথমত, বিচ্ছিন্নতার মূল কি (রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও জনসাধারণের দিক থেকে)? এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, যে ভারতবর্ষের সর্বনাশের মূল কারণ দেশের সমগ্র বিদ্যা-বুদ্ধি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজ্যশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ হয়ে আছে। অন্যত্র লিখেছেন, যে আমাদের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দরিদ্র। এই কারণেই সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যহিক অভাব এতই ভয়ানক যে সে আর কিছু ভাববার অবসর পায়না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের দিক থেকে নিপীড়নের মূল উৎস এবং জনসাধারণের দিক থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎস, এই দিকগুলির দিকে আঙুল নির্দেশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই বিচ্ছিন্নতার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন—"ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব।...এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে।"[৩৪] ধর্ম-ভাষা-কৃষ্টি-ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেই বিচ্ছিন্নতাবোধের বিভিন্ন প্রকাশ ঘটছে, কিন্তু এর উৎসমূল বিচ্ছিন্নতা।

বর্তমান যুগের কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক। বিচ্ছিন্নতার নানান রূপ আছে, শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এর সম্পূর্ণ রূপটি বোঝা যাবেনা। রাশিয়ার মোট আবাদী জমির মাত্র ১'৫% ব্যক্তিগত

মালিকানায় রয়েছে কৃষকদের হাতে, বাকীটা রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় বড় বড় খামারে। অথচ ব্যক্তিগত জোতে উৎপন্ন কৃষিপণ্য থেকে কৃষকেরা ১৯৫০ সালে উপার্জন করেছিল ১৯'৬ মিলিয়ন রুবল যেখানে যৌথ-খামার থেকে উপার্জন ছিল ১৫ মিলিয়ন রুবল ; ১৯৫০ সালে এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০'৪ এবং ১৬'৬ মিলিয়ন রুবল।[৫] অর্থাৎ কৃষকদের উৎপাদন-দক্ষতা রাষ্ট্রীয় খামারের চেয়ে ব্যক্তিগত জমিতেইবেশি। রুশ শিল্প প্রসঙ্গে পল্ সুইজি বলেছেন, অধিক পুঁজি-বিনিয়োগ ও উন্নত যন্ত্র দিয়েও শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়ান যাচ্ছেনা কারণ উৎপাদনে তারা কোন আগ্রহবোধ করছেনা।[৬] এটিকে সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা বললে ভুল হবে, এটি আসলে বিচ্ছিন্নতার অর্থনৈতিক প্রকাশ। আবার ভারতবর্ষের নির্বাচনে জনসাধারণ যখন নেতিবাচক ভোট দেয় (১৯৫৭ ও ১৯৫০-র সাধারণ নির্বাচনে, কিংবা ১৯৫৭ সালে পঃবঙ্গে লোকসভা-নির্বাচনের আসনগুলিতে) সেটি হল বিচ্ছিন্নতার রাজনৈতিক প্রকাশ।

এই বিচ্ছিন্নতাকে বিবেকানন্দ খুঁজেছেন চারটি শাসন বা রাষ্ট্র চরিত্রের মধ্যে। মানুষের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিসত্তার সংঘাত যুগে-যুগেই রয়েছে। তাই বিশেষ যুগের আলোচনায় ঐ যুগে এই সংঘাতের বৈশিষ্ট্য ধরা দরকার। অর্থাৎ এই সংঘাতের উৎস কি বা কোন্ সামাজিক শক্তি (জ্ঞান, অস্ত্র, অর্থ, শ্রম), কোন ক্ষেত্রে এবং কি ধরণের। এ-বিষয়ে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করব।

আমরা আগেই দেখেছি, রাষ্ট্র নিজের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে চায় আর জনসাধারণ নিজেদের অধিকারগুলি রক্ষা করতে চায় যার ফলে রাষ্ট্রীয় সংকট ঘনিয়ে আসে। বিবেকানন্দ কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও সামাজিক আন্দোলনকে বড় করে দেখেছিলেন।[৭] নির্দিষ্ট দেশ-কালে সামাজিক বাস্তবতা বনাম ব্যক্তিচেতনার সংঘাত প্রকাশ পায় বিভিন্নভাবে, কিন্তু-সংগ্রামের মাধ্যমে এগুলি একটি নির্দিষ্ট রূপ নেয়। যদিও সংঘাতটি বহুমাত্রিক তবুও দেশ-কাল অনুযায়ী এক নির্দিষ্ট মাত্রা ধরে সংগ্রামের এক সাধারণ প্রয়োজনবোধ দেখা দেয়। বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বৈশ্যশাসনে অর্থের কেন্দ্রীকরণ বা পুঁজিই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয় মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধে। কিন্তু তা বলে বৈশ্যশাসনের সব নিপীড়নই যে পুঁজি থেকে উদ্ভূত এ-কথা ঠিক নয়। এই নিপীড়নের বহুমাত্রিক ধারার বেশ কিছু চলে এসেছে পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থা থেকে। পার্থক্য এই যে পূর্ববর্তী

সমাজের সেই নিপীড়ন-ধারাগুলি বৈশ্যশাসনের যুগে নতুন ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থাৎ বৈশ্যশাসনের অবসানের নামে শুধু পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করলে সেই সংগ্রাম হয়ে পড়বে একমাত্রিক। এটি ধরতে না পারার জন্যই ব্যক্তিগত পুঁজির উচ্ছেদ করেও রাশিয়ার শোষণ বন্ধ হয় নি। পুরনো নিপীড়ন এজন্যই সমাজব্যবস্থায় রয়ে গেছে, নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গির বদল ঘটেছে মাত্র। রাশিয়ায় স্তালিন-শাসনের প্রকৃত রূপ শুধু রাজনৈতিক লড়াই বিশ্লেষণে বোঝা যাবেনা যদি তার সামাজিক দিকটা লক্ষ্য করা না হয়। স্তালিনের কঠোর শৃঙ্খলা, নিপীড়ন, বা গুপ্ত পুলিশ ছিল ঠিকই, কিন্তু রুশ জনসাধারণ তাকে মেনে নিয়েছিল শুধু এই কারণেই নয়। বস্তুত কর্তৃত্ববাদী ও পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যে পালিত রুশ জনসাধারণ উদার গণতন্ত্রের চেয়ে সুদৃঢ় শক্তিশালী রাষ্ট্র পছন্দ করেছিল কারণ এটি তাদের চরিত্রের বিরোধী ছিল না। স্তালিন জার-আমলের মতোই নিপীড়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন—সাইবেরিয়ার শ্রম-শিবির, গুপ্ত পুলিশ, সন্ত্রাস।

আরেকটি ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করা যাক। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণশাসন এবং রাশিয়ার স্তালিনের শূদ্রশাসন—এই দুটিই জনসাধারণের মনে যুগপৎ ভয় ও মোহের সঞ্চার করতে পেরেছিল, যার ফলে জনসাধারণের সমর্থন পেতে রাষ্ট্রের পক্ষে খুব অসুবিধা হয় নি। ব্রাহ্মণেরা যেমন শাস্ত্রের সাহায্যে ভয় দেখাতেন, তেমনি স্বর্গলাভ ও পুণ্যের লোভও মানুষের সামনে রাখতেন। স্তালিন একদিকে যেমন শ্রমশিবির ও গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে ভয় দেখাতেন, অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী জয়যাত্রার মোহ দেখিয়ে রুশ শ্রমিকদের মধ্যে মোহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ শাসন ও শূদ্রশাসনের নিপীড়নে ভয় ও লোভের এই দ্বৈত ভূমিকা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একে বিশ্লেষণ করতে হলে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সামাজিক বিশ্লেষণ করতে হবে। তাতেই বোঝা যাবে, এগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপটি। একটি শাসনের নিপীড়ন যে সামাজিক মনস্তত্ত্বের বাতাবরণ তৈরী করে, সেই মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে না, এর প্রকাশ দেখা যায় সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এবং এর পেছনে কাজ করে পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। আর

মানুষ এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মোকাবিলা করে তার সামাজিক মানসিকতা দিয়েই, যে মানসিকতা সে লাভ করেছে ঐতিহ্যসূত্রে। যদিও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই মানসিকতা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সংগ্রামকে তুলে ধরে। সংগ্রামের পক্ষে এই নির্দিষ্ট ধারা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এই ধারাটির উৎপত্তি যে ঘাত-প্রতিঘাতে ও সমাজ-মানসিকতার ফলে, সেগুলিকে চোখের সামনে না রাখলে বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায়, নতুন রূপে আবির্ভূত হয় বহু পুরনো সমস্যা।

রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধি

বিবেকানন্দ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচয় দিয়ে সেগুলির ভাল-মন্দ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়—"প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।"[৮] "বর্তমান ভারত" বইয়ে তিনি এসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা সেই প্রসঙ্গের অনুসরণ করে দেখার চেষ্টা করব কিভাবে রাষ্ট্রের কলেবর ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

ব্রাহ্মণ শাসনে রাষ্ট্রের পরিচালনা প্রত্যক্ষত ক্ষত্রিয়ের হাতেই থাকে, ব্রাহ্মণেরা বাইরে থেকে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখে। ব্রাহ্মণরা সব সময়ই নজর রাখে যাতে ক্ষত্রিয়রা শক্তিশালী না হয়ে ওঠে। এই শাসনে বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের nation-state অথবা primacy of the state তত্ত্বকে স্বীকার করা হয় না; রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বহিরাক্রমণের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা (ক্ষত্রিয়=যিনি সমাজকে ক্ষত থেকে ত্রাণ করেন), কিন্তু সামাজিক সংঘর্ষের নিরসনে রাষ্ট্রই শেষ কথা নয়, সামাজিক মূল্যবোধ বা মতাদর্শই, এ-ব্যাপারে নিয়ামক। এই সামাজিক মূল্যবোধ যা প্রাচ্যদেশীয় ভারত ও চীনের সমাজে প্রধান ছিল, এর সাথে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় আইনের পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রই আইন প্রচলনের কর্তা, প্রাচ্যে রাষ্ট্রকেও সামাজিক আইন মেনে চলতে হত। এজন্যই primacy of the state স্বীকৃতি পায় নি এবং রাষ্ট্রশক্তিও সবল হয়ে ওঠেনি।

ক্ষত্রিয়শাসনে রাজারা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করার সাথে সাথে রাষ্ট্রের কলেবর বাড়ে। রাজকীয় কর্মচারী, বিশাল সেনাবাহিনী ও তার পদস্থ সেনাপতিরা, সামন্তবর্গ প্রমুখের ক্ষমতা বাড়ে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে স্তর

অনুযায়ী নানা ধরণের পদের সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র-সংগঠন কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে এই ক্ষত্রিয়শাসনেই এবং primacy of the state ধারণাও দানা বাঁধে। এ-শাসনে ছোট রাজা যেমন দেখা যায়, তেমনি একচ্ছত্র সম্রাটের দেখাও মেলে। বৈশ্য ও বণিকশ্রেণী কিন্তু ছোট-ছোট রাজার চেয়ে একচ্ছত্র সম্রাটকেই বেশি পছন্দ করে কারণ ছোট রাজার সংখ্যা বেশি হলে রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে পণ্য-চলাচলে নানারকম শুল্ক দিতে হয়। আর বড় রাজ্য হলে শুল্ক-ব্যবস্থা যেমন নিয়মিত হয় তেমনি কঠোর আইন-শৃঙ্খলায় ব্যবসা করতে সুবিধা হয়।

বৈশ্য শাসনে এর ফলেই সর্বত্র সমান আইনের ওপর জোর দেওয়া হয়। বিচার-বিভাগ ও প্রশাসনের ব্যাপকতা দেখা দেয়। ভাড়াটে সৈন্যের বদলে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এইসব কারণে রাষ্ট্রের কলেবরও অনেক বেশি বেড়ে যায় ক্ষত্রিয়শাসনের চেয়ে। ব্রাহ্মণদের অনুশাসন ও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশক্তি যাতে স্বাধীন ব্যবসায় বাঁধার সৃষ্টি না করতে পারে সেজন্য বৈশ্যরা জনসাধারণের সাথে বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয় এবং সংসদকে শক্তিশালী করে তোলে। এই সংসদের মাধ্যমেই আইনের সামনে জনসাধারণের সমানাধিকার স্বীকৃতি পায় এবং বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে একে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে—গণতান্ত্রিক পরিবেশে—বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক সংগঠন ও দল গড়ে ওঠে।

শূদ্র শাসনে রাষ্ট্রের কলেবর আরও বেড়ে যায়, কারণ অন্যান্য শ্রেণীকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রকে সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হতে হয়। বৈশ্যশাসনে বৈশ্যরা আইনকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে, কিন্তু শূদ্রশাসনে শাসকগোষ্ঠী এই কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে। রাষ্ট্রের একমুখী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র একমুখী (monolith) হয়ে পড়ে। বৈশ্যশাসনের মতো প্রশাসন-বিচারবিভাগ-সেনাবাহিনী ইত্যাদি তো থাকেই, তাছাড়া অর্থনীতি-উৎপাদন-বন্টন-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলিও রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়ে আসার ফলে রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলির স্তরবিন্যাস অনেক বেশি হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধির অর্থই হল রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ-স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। এর যেমন ভাল দিক আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। লক্ষ্য করা দরকার, এই সংযোগ সমূহ কি একমুখী, না উভমুখী? এই সংযোগ স্থানগুলির চরিত্রের ওপরই নির্ভর করে জনসাধারণ রাষ্ট্রের সাথে কতখানি একাত্ম বা বিচ্ছিন্ন বোধ করবে। যেহেতু এই অধ্যায়ে আমাদের

মানুষ এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মোকাবিলা করে তার সামাজিক মানসিকতা দিয়েই, যে মানসিকতা সে লাভ করেছে ঐতিহ্যসূত্রে। যদিও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই মানসিকতা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সংগ্রামকে তুলে ধরে। সংগ্রামের পক্ষে এই নির্দিষ্ট ধারা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এই ধারাটির উৎপত্তি যে ঘাত-প্রতিঘাতে ও সমাজ-মানসিকতার ফলে, সেগুলিকে চোখের সামনে না রাখলে বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায়, নতুন রূপে আবির্ভূত হয় বহু পুরনো সমস্যা।

রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধি

বিবেকানন্দ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচয় দিয়ে সেগুলির ভাল-মন্দ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়—"প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।"[৮] "বর্তমান ভারত" বইয়ে তিনি এসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা সেই প্রসঙ্গের অনুসরণ করে দেখার চেষ্টা করব কিভাবে রাষ্ট্রের কলেবর ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

ব্রাহ্মণ শাসনে রাষ্ট্রের পরিচালনা প্রত্যক্ষত ক্ষত্রিয়ের হাতেই থাকে, ব্রাহ্মণেরা বাইরে থেকে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখে। ব্রাহ্মণরা সব সময়ই নজর রাখে যাতে ক্ষত্রিয়রা শক্তিশালী না হয়ে ওঠে। এই শাসনে বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের nation-state অথবা primacy of the state তত্ত্বকে স্বীকার করা হয় না; রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বহিরাক্রমণের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা (ক্ষত্রিয়=যিনি সমাজকে ক্ষত থেকে ত্রাণ করেন), কিন্তু সামাজিক সংঘর্ষের নিরসনে রাষ্ট্রই শেষ কথা নয়, সামাজিক মূল্যবোধ বা মতাদর্শই, এ-ব্যাপারে নিয়ামক। এই সামাজিক মূল্যবোধ যা প্রাচ্যদেশীয় ভারত ও চীনের সমাজে প্রধান ছিল, এর সাথে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় আইনের পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রই আইন প্রচলনের কর্তা, প্রাচ্যে রাষ্ট্রকেও সামাজিক আইন মেনে চলতে হত। এজন্যই primacy of the state স্বীকৃতি পায় নি এবং রাষ্ট্রশক্তিও সবল হয়ে ওঠেনি।

ক্ষত্রিয়শাসনে রাজারা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করার সাথে সাথে রাষ্ট্রের কলেবর বাড়ে। রাজকীয় কর্মচারী, বিশাল সেনাবাহিনী ও তার পদস্থ সেনাপতিরা, সামন্তবর্গ প্রমুখের ক্ষমতা বাড়ে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে স্তর

অনুযায়ী নানা ধরণের পদের সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র-সংগঠন কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে এই ক্ষত্রিয়শাসনেই এবং primacy of the state ধারণাও দানা বাঁধে। এ-শাসনে ছোট রাজা যেমন দেখা যায়, তেমনি একচ্ছত্র সম্রাটের দেখাও মেলে। বৈশ্য ও বণিকশ্রেণী কিন্তু ছোট-ছোট রাজার চেয়ে একচ্ছত্র সম্রাটকেই বেশি পছন্দ করে কারণ ছোট রাজার সংখ্যা বেশি হলে রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে পণ্য-চলাচলে নানারকম শুল্ক দিতে হয়। আর বড় রাজ্য হলে শুল্ক-ব্যবস্থা যেমন নিয়মিত হয় তেমনি কঠোর আইন-শৃঙ্খলায় ব্যবসা করতে সুবিধা হয়।

বৈশ্য শাসনে এর ফলেই সর্বত্র সমান আইনের ওপর জোর দেওয়া হয়। বিচার-বিভাগ ও প্রশাসনের ব্যাপকতা দেখা দেয়। ভাড়াটে সৈন্যের বদলে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এইসব কারণে রাষ্ট্রের কলেবরও অনেক বেশি বেড়ে যায় ক্ষত্রিয়শাসনের চেয়ে। ব্রাহ্মণদের অনুশাসন ও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশক্তি যাতে স্বাধীন ব্যবসায় বাঁধার সৃষ্টি না করতে পারে সেজন্য বৈশ্যরা জনসাধারণের সাথে বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয় এবং সংসদকে শক্তিশালী করে তোলে। এই সংসদের মাধ্যমেই আইনের সামনে জনসাধারণের সমানাধিকার স্বীকৃতি পায় এবং বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে একে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে—গণতান্ত্রিক পরিবেশে—বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক সংগঠন ও দল গড়ে ওঠে।

শূদ্র শাসনে রাষ্ট্রের কলেবর আরও বেড়ে যায়, কারণ অন্যান্য শ্রেণীকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রকে সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হতে হয়। বৈশ্যশাসনে বৈশ্যরা আইনকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে, কিন্তু শূদ্রশাসনে শাসকগোষ্ঠী এই কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে। রাষ্ট্রের একমুখী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র একমুখী (monolith) হয়ে পড়ে। বৈশ্যশাসনের মতো প্রশাসন-বিচারবিভাগ-সেনাবাহিনী ইত্যাদি তো থাকেই, তাছাড়া অর্থনীতি-উৎপাদন-বণ্টন-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলিও রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়ে আসার ফলে রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলির স্তরবিন্যাস অনেক বেশি হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধির অর্থই হল রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ-স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। এর যেমন ভাল দিক আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। লক্ষ্য করা দরকার, এই সংযোগ সমূহ কি একমুখী, না উভমুখী? এই সংযোগ স্থানগুলির চরিত্রের ওপরই নির্ভর করে জনসাধারণ রাষ্ট্রের সাথে কতখানি একাত্ম বা বিচ্ছিন্ন বোধ করবে। যেহেতু এই অধ্যায়ে আমাদের

আলোচ্য বিষয় কিভাবে একটি শাসন বা রাষ্ট্র ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে অন্য শাসনের আবির্ভাব হয়, সেহেতু রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার দিক-গুলির ওপরই আমরা এখানে বেশি দৃষ্টি দেব।

রাষ্ট্রের ভিত্তি যেহেতু সামাজিক উপাদান, সেহেতু সামাজিক মৌল চারটি শক্তির (জ্ঞান, অস্ত্র বা শৌর্য, অর্থ, শ্রম) ব্যাপারে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের ভূমিকা লক্ষ্য করলে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দিকগুলির চিত্র পাওয়া যাবে। জ্ঞানের দিকটির দেখা মেলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলে। শৌর্যগত বিষয়টি ধরা পড়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে। অর্থ সম্পর্কিত শক্তির ব্যবহার বোঝা যায় অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায়। এবং শ্রম বিষয়টি পরিস্ফুট মানুষের জীবিকা প্রসঙ্গে। এই চারটি মৌলশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থায় ও জনসাধারণের জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা লক্ষ্য করলেই বিচ্ছিন্নতার প্রধান মাত্রাগুলিকে বোঝা যাবে। আলোচনার সুবিধার জন্য ব্রাহ্মণশাসন ও ক্ষত্রিয়শাসন প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারত, বৈশ্য শাসন প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড, এবং শূদ্রশাসন প্রসঙ্গে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অবস্থা বিশ্লেষণ করব একাদিক্রমে।

ব্রাহ্মণশাসন

জ্ঞান শক্তিটির ক্রিয়া বোঝার জন্য সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে তাকানো যাক। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণশাসনে গুরুগৃহে পড়তে যেত প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা। বৈশ্য সন্তান বেশি সংখ্যায় যেত না কারণ তাদের কাছে শাস্ত্রশিক্ষার চেয়ে অর্থকারী ও শিল্পশিক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। যদিও গুরুগৃহে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল, তবুও সে যুগে শিল্প মোটামুটিভাবে পুরুষানুক্রমে ছিল এবং একই লোককে নিজস্ব শিল্পের সব কাজ বা অংশই করতে হত। শূদ্রেরাও গুরুগৃহে যেত, তবে খুবই কম সংখ্যায় কারণ ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার সাথে তাদের কাজ করতে হত কৃষি ইত্যাদিতে। অধিকাংশ জনসাধারণই ছিল শূদ্র (বর্ণগত নয়, কর্মগত হিসেবে বলা হচ্ছে বিবেকানন্দ-দৃষ্টি অনুযায়ী) এবং শিক্ষার অভাবে এরা নিজস্ব সীমিত গণ্ডিতেই থাকত। সংস্কৃতিগত দুটি ধারা এর ফলে তৈরী হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতিকে মনে করা হত উচ্চ ঐতিহ্য, এবং সাধারণ মানুষের জন্য লোকঐতিহ্য। লোক-ঐতিহ্যের স্থান ছিল সংস্কৃতিগতভাবে নীচে। এই ধারণা সমাজ মেনে নিয়েছিল এবং লোক ঐতিহ্যের মানুষ শিক্ষিতদের সভায় প্রতিনিধিত্ব করতে বা যোগ

দিতে পারত না। সমাজের সম্মানও দাবি করতে পারত না। ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই শূদ্রেরা হীনমন্যতার শিকার হত। শিক্ষা ও সংস্কৃতি দু-দিক থেকেই তারা নিজেদের অবনমিত অবস্থা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং এভাবে বিচ্ছিন্ন মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষার অভাবে নিজস্ব সীমিত গণ্ডির বাইরে তাদের দৃষ্টি যেত না এবং মতাদর্শ এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে আরও সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।

শৌর্য বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানান আইন-কানুন ছিল, কিন্তু বিবেকানন্দের ভাষায়—"তাহার মূলে ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ।"[৯] ফলে আইন বা আচার নিয়ে জনসাধারণ প্রশ্ন করতে পারত না। তারা মেনে নিতে বাধ্য হত, তাদের ওপর আইন চাপিয়ে দেওয়া হত। এ ধরণের আইনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—বিবেকানন্দ লিখেছেন—"তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য-সাধনোদ্দেশ্যে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তিলাভেচ্ছার কোন শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।"[১০] আইনের এই স্থিতিস্থাপকত্ব (flexibility) না থাকায় পরিস্থিতি বদলালেও আইন পরিবর্তিত হত না, বরং জনসাধারণ নিজেদেরই ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে চলতে বাধ্য হত। আইন-প্রণয়নে জনসাধারণের মতামতের অপেক্ষা করা হত না বলে তারা মানসিক দিক থেকে এর সাথে একাত্মতা অনুভব করত না। এভাবে প্রশাসনিক আইন-কানুনের ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছিল।

বিবেকানন্দের উপরোক্ত উক্তিতে দেখা যায়, অর্থ প্রসঙ্গে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে বা আয়-ব্যয়ের ব্যাপারেও প্রজাদের স্বত্ববুদ্ধি ছিল না। তাছাড়া শ্রম বা জীবিকার ব্যাপারে প্রধান ছিল বর্ণব্যবস্থা; মানুষের কর্মদক্ষতা নয়, বরং জন্ম দিয়েই ঠিক হত কে কোন্ পেশা গ্রহণ করবে। এর পেছনেও ছিল শাস্ত্রীয় নির্দেশ, যার ফলে নিজের ইচ্ছানুসারে যে-কোনও জীবিকা গ্রহণ করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হত জনসাধারণ। এরই প্রভাব পড়েছিল অর্থনৈতিক অবস্থায়। উৎপাদনে যেমন মানুষ নিজের ইচ্ছামতো অংশগ্রহণ করতে পারত না, তেমনি বন্টনের ব্যাপারেও উপকৃত হত ব্রাহ্মণেরা। দান করা আবশ্যিক ও পুণ্য কর্ম বলে বিবেচিত হত।

ব্রাহ্মণশাসনে রাষ্ট্রীয় আইন চাপিয়ে দেওয়া হয় জনসাধারণের ওপর, যার ফলে শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষ কতগুলি নিয়ম মেনে নিতে বাধ্য হয়।

অভিজাত গোষ্ঠী নিজস্ব স্বার্থ বজায় রাখে এর মাধ্যমে। এই আইনগুলির ভিত্তি ধর্মীয় মতাদর্শ। এই মতাদর্শকে দেখা হয় সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব হিসাবে। এ থেকে বিচ্যুতি সামাজিক তথা ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবোধকে অস্বীকার করারই নামান্তর শাসক ও জনসাধারণের কাছে। জনসাধারণ প্রশাসনিক ব্যাপারে যোগ দিচ্ছে না বা উৎসাহিত হচ্ছে না, কারণ তারা মনে করছে এই বিষয়টি ক্ষত্রিয়দের এবং আইনের সৃষ্টি করা ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব। এভাবেই নির্ভরশীলতার মনোভাব ব্যাপক হয়ে ওঠে। মানুষ মনে করছে যে তাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা এই আইনগুলি করেছে। ফলে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কোন কোন আইনের সদর্থক চরিত্র প্রমাণিত না হলেও মানুষ এর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। রাজা জনসাধারণের ওপর বেশি অত্যাচার করতে পারে না, কারণ রাজাকেও মেনে চলতে হয় ধর্মীয় অনুশাসন যা না মানলে তার সিংহাসন বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। এভাবে ব্রাহ্মণেরা রাজার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। অনুরূপভাবে মূল পরিচালিকা গোষ্ঠী ব্রাহ্মণদেরও আইন মেনে চলতে হয়। যেহেতু এই মতাদর্শকে মানুষের অস্তিত্বের সাথে এক করে দেখা হয়, সেহেতু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মতাদর্শকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা হয়। এর ফলে মানুষের কাছে মতাদর্শ এক অনড় ব্যবস্থা হিসেবে দেখা দেয়।

এভাবে জ্ঞান-শৌর্য-অর্থ-শ্রম সবদিকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদমন দেখা দিয়েছিল, যার পরিণতি জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতাবোধ। বিভিন্ন মাত্রা (dimension) ধরে প্রকাশ পেয়েছিল এই বোধ। কিন্তু মূল ভূমিকা নিয়েছিল জ্ঞান বা আদর্শ। বস্তুত এই মতাদর্শই, যা ছিল ধর্মীয়, ব্রাহ্মণ শাসনের মূল ভিত্তি। মানুষ এই শাসনকে মেনে নিয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিল মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ শাসনের মতো মধ্যযুগে ইওরোপীয় পোপতন্ত্র এবং বর্তমান যুগে আরব রাষ্ট্রগুলির মোল্লাতন্ত্রও দাঁড়িয়ে থাকে নিজস্ব মতাদর্শকে (ideology) আশ্রয় করেই। পুরোহিতবৃন্দ (priests) এই মতাদর্শকে নিজেদের কুক্ষিগত করে জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণ করে এবং এভাবেই জনসাধারণ বঞ্চনার শিকার হয়!

ক্ষত্রিয় শাসন

জ্ঞান বিকেন্দ্রায়িত হয়ে পড়ে ক্ষত্রিয় শাসনে। রাজার স্নেহদৃষ্টিতে পড়লে

জীবিকা ও কর্মের ব্যাপারে জাতিবর্ণ আর তেমন বাধা নয়। এই শাসনে শিল্পচর্চা বাড়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও চর্চা দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজাকে দেব-প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হত। এমন-কি সম্রাট অশোকও রাজ-কর্মচারীদের নির্দেশে দিয়েছিলেন: "জনসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস জন্মানো চাই যে আমাদের চোখে রাজা হলেন পিতৃতুল্য।"[১১] ব্রাহ্মণশাসনের মতো মতাদর্শ অতটা প্রভাবশালী ছিল না। মানুষ স্বাধীনভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করতে পারত, কিন্তু রাজার ক্ষমতা যে অপ্রতিহত তা স্বীকার করে নিতে হত।

শৌর্য বা প্রশাসনের ব্যাপারে রাষ্ট্রের আয়তন বেড়েছে। জনসাধারণও আগের চেয়ে বেশি ব্যাপারে রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে রাজকর্ম-চারীদের মাধ্যমে। ব্রাহ্মণশাসনে যুদ্ধ হত ধর্মযুদ্ধ, ক্রুসেড বা জেহাদ যার ফলে প্রজারা অনেকটা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিত, কিন্তু ক্ষত্রিয়শাসনে প্রজারা দেখল যে যুদ্ধ হচ্ছে রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছার ফলে, এবং যুদ্ধ প্রজাদের করতে হচ্ছে যা তাদের স্বার্থের চেয়ে রাজার স্বার্থেরই অনুকূল। ৪৩৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে এথেন্স অন্যায়ভাবে জয় করে স্যামস্ রাষ্ট্রকে। সোফোক্লিস সেই যুদ্ধে এথেন্স বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। "আন্তিগোনে" নাটকে এ প্রশ্নই তুললেন: এথেন্স জিতেছে ঠিকই, কিন্তু এটি কার স্বার্থসিদ্ধি করল? যুদ্ধ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের কাজকে প্রশ্ন করেছিলেন সোফোক্লিস।

শ্রম বা জীবিকায় নতুন নতুন পেশার দিক খুলে যায় ক্ষত্রিয়শাসনে। কিন্তু শিল্পের ব্যাপারে রাজার ইচ্ছার ফলে অনেক পুরনো শিল্প বাতিল হয়ে পড়ে নতুনের চাহিদায়। এ-সময় সৈন্যের সংখ্যা বাড়ে এবং বহু লোক এই জীবিকা গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু এরা বেশির ভাগই ভাড়াটে সৈন্য, সেহেতু নিজের রাজার চেয়ে বেশি অনুরক্ত হয় যে-রাজা বেশি মাইনে দিতে পারবে তার প্রতি। ফলে স্বদেশের রাজার প্রতি এদের আত্ম-সংযুক্তি কম থাকে।

অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায়ও রাজার নির্দেশই প্রধান। এই নির্দেশ বা আইনের স্থিতিস্থাপকত্ব (flexibility) থাকে, প্রয়োজন-অনুসারে আইনের পরিবর্তনও ঘটে, কিন্তু এই প্রয়োজন যতটা না প্রজাদের, তার চেয়েও বেশি রাজার। তাছাড়া যেহেতু রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু জনসাধারণের দেয় করের পরিমাণ বাড়ে। এই সংগৃহিত কর তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনকল্যাণের চেয়েও বেশি খরচ হয় রাজার নিজের বিলাস ও রাজরক্ষা অর্থাৎ সেনাবাহিনী

ও রাজকর্মচারীদের জন্ম, তাছাড়া রাজ-অমাত্যেরা তো আছেই।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান-শৌর্য-অর্থ-শ্রম এই চারটি ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়শাসনেও জনসাধারণের মনে বিভিন্ন মাত্রার বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়, যদিও ব্রাহ্মণশাসন থেকে এর মাত্রাগত পার্থক্য আছে। ক্ষত্রিয়শাসন টিকে থাকে অস্ত্রের জোরে। এটিই ক্ষত্রিয়শাসনের মূল শক্তি। জনসাধারণ ব্রাহ্মণশাসনকে মানতে বাধ্য হত মতাদর্শগত প্রভাবে, আর ক্ষত্রিয়শাসনকে মানতে বাধ্য হয় অস্ত্রশক্তির প্রভাবে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও জমিদারের ভূমিকা গ্রামবাসীদের ওপর কি-রকম ছিল এটি লক্ষ্য করলেই বিষয়টি বোঝা যায়। গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে মানতো মতাদর্শগত প্রভাবে এবং জমিদারকে মানত লেঠেল-বরকন্দাজের ভয়ে।

বৈশ্যশাসন

জ্ঞানের যে দুটি প্রধান ক্ষেত্র—শিক্ষা ও সংস্কৃতি—এই দুটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ঘটল বৈশ্যশাসনে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার বাড়ছে কিন্তু বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হচ্ছে অর্থের মানদণ্ডে। শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং এরফলে সাধারণ কাজের চেয়ে বিশেষজ্ঞের (specialist) চাহিদা বাড়ে। তাছাড়া বৈশ্যশাসনে রাষ্ট্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনে দক্ষ লোকেরই বেশি চাহিদা থাকে। বৈশ্যশাসন সব কাজেই দক্ষতার (efficiency) ওপর জোর দেয়। ক্ষত্রিয়শাসনে শাসকগোষ্ঠী নিজের বিলাসে প্রচুর খরচ করে, কিন্তু বৈশ্যরা অমিতব্যয়ী হয়না, বরং মুনাফাকে পুনর্নিয়োগ করে পুঁজির বৃদ্ধিতে। অর্থ নৈতিক ধারা প্রধান হওয়ায়, যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক হওয়ায়, এবং প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার বৈশ্যশাসনে কর্মদক্ষতার দাম বেশি। ক্ষত্রিয়শাসনে কিন্তু রাজা ও সম্রাটেরা নিজেদের প্রিয় পাত্রদেরই প্রধান-প্রধান পদে বসায়। ক্ষত্রিয়েরা মূলত অর্থ সংগ্রহের ওপর নজর দেয়, কিন্তু বৈশ্যরা অর্থ উৎপাদন করে। এভাবে সমাজেও দক্ষতা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যার ফলে মানুষ নিজের রুচিমতো শিক্ষা বা জীবিকা নিতে ইতস্তত করে, অর্থকরী শিক্ষা ও জীবিকা তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। ক্ষত্রিয়শাসনে কুটিরশিল্পীকে সব কাজই করতে হয় নিজে, কিন্তু বৈশ্য-শাসনে কোন শিল্পের একটি অংশে কাজ করার উপযোগী সে। এরই পরিণতিতে একটি কাজ হারালে অন্য নতুন কাজ খুঁজে নেওয়া মুস্কিল। তাছাড়া ব্যাপক উৎপাদনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কুটির শিল্পীর ঘরোয়া স্বপ্নশান্তির

ভূমিকা কমে আসে। উৎপাদনের হাতিয়ারের ওপর ক্ষমতা কমে যায় বা একেবারেই থাকে না। বৈশ্যশাসনে এই দিকগুলির প্রতি বিবেকানন্দ বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

বিদ্যা ও জীবিকার ক্ষেত্রে অর্থকরী বিষয় প্রধান হয়ে ওঠায় এবং অর্থের মানদণ্ডে অধিকাংশ বিষয়ের মূল্যায়ন শুরু হওয়ায় মানুষের মূল্যবোধে অবক্ষয় শুরু হয়। গৃহ ও কর্মক্ষেত্র পৃথক হয়ে যাবার ফলে দুই ক্ষেত্রে দু-ধরণের মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং সেই সাথে শুরু হয় এই দুয়ের সংঘর্ষ। ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে এর শেকড় নামে অনেক দূর পর্যন্ত। যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক হওয়ায় এবং নিত্যনতুন পণ্যের আবির্ভাবে মানুষের সামাজিক সত্তার (social aspect) বৃদ্ধি ঘটে এবং ব্যক্তিসত্তা (individual aspect) এর সাথে তাল রাখতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।

ক্ষত্রিয়শাসন রাজস্ব আদায়ে জোর দিলেও মানুষের ব্যক্তিজীবনে বিশেষ হস্তক্ষেপ করত না। বৈশ্যশাসনে সংসদ ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা এবং আইনের ব্যাপকতায় রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ বিন্দুগুলির (meeting points) সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ফলে সমাজের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে। আইনের শাসন—সংসদ ও বিচার ব্যবস্থার পৃথক অস্তিত্ব—বৈশ্যশাসনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ফলে মানুষ অনেক সময়ই তার বিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারে না যেহেতু এগুলিতে (ভোটের মাধ্যমে সংসদ-সদস্য নির্বাচনে) তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। এজন্য বিচ্ছিন্নতাবোধ থাকলেও মানুষ তার উৎসকে সবসময় ধরতে পারে না। শাসকদের গণ-সংযোগের ফলে রাষ্ট্র ক্ষত্রিয়শাসনের মতো প্রত্যক্ষ নিপীড়ন চালায় না, বরং বিভিন্ন পথে পরোক্ষভাবে অবদমনের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। এজন্য বিবেকানন্দ লিখেছেন, "বৈশ্যশাসন এর ভেতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্ত শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ।"[১২]

শূদ্রশাসন

বৈশ্যদের দমন করার জন্য শূদ্রশাসন অত্যধিক নজর দেয় ; ফলে সমাজের প্রতি স্তরে রাষ্ট্রের বাহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সামাজিক বা অরাজনৈতিক গণসংগঠনের সংখ্যা কমে আসে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রশাসন-উৎপাদন-বণ্টন-জীবিকা বেশি ইত্যাদিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাড়ে। ফলে শূদ্র শাসনে রাষ্ট্রের কলেবর অনেক

বেড়ে যায় এবং তা একটি Monolithএ পরিণত বা সর্বাত্মক (totalitarian) রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। এভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের মুখোমুখি হয়।

জ্ঞান বা বিদ্যাচর্চায় রাষ্ট্রীয় মতাদর্শই চূড়ান্ত সত্য বলে পরিগণিত হয় এবং এর বিরোধিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। অন্যধরণের জ্ঞানচর্চাকে বিশেষ বাধা দেওয়া হয় না, তবে সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় নির্দেশেই Utopian বা অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে প্রাতিষ্ঠানিক মতাদর্শই প্রশাসনে প্রধান বিবেচ্য বলে জীবিকা ও অন্যান্য ব্যাপারে এর হস্তক্ষেপ মানুষ সহজেই বোঝে। কর্মের সংস্থান বাড়ে, মোটা ভাত-কাপড়ের সুবিধাও বাড়ে, কিন্তু আর্থিক বিধিব্যবস্থা ও জীবিকার ব্যাপারে মানুষ রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। জনসাধারণ রাষ্ট্রের একমুখী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে।

ব্রাহ্মণশাসন, ক্ষত্রিয়শাসন ও বৈশ্যশাসনে যথাক্রমে জ্ঞান, শৌর্য ও অর্থের কেন্দ্রীকরণ যেমন ঘটে রাষ্ট্রের হাতে, তেমনি শূদ্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ ঘটে মানুষের বা শ্রমের—এবিষয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য আমরা আগেই দেখেছি। রাশিয়ার দিকে তাকালে শূদ্রশাসনে শ্রমের কেন্দ্রীকরণ ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

বিপ্লবের পর উৎপাদন-ব্যবস্থার সামাজীকরণের নামে শ্রমিক কৃষকদের আনা হল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে, কেন্দ্রীভূত করা হল সমাজের শ্রমশক্তিকে। "সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা"—বিপ্লবের আগে লেনিন এই ডাক দিলেও বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে সরকারী নির্দেশ জারী হল সোভিয়েতগুলিকে পার্টি তথা রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসার জন্য। পার্টি-নেতাদের অধীনে সব কটি সোভিয়েতের জন্য তৈরী হল বিপ্লবী কমিটি। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লিয়েবমান তাঁর "লেনিনিজম্ আণ্ডার লেনিন" বইয়ে। এভাবে কৃষকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার সাথে সাথে শিল্পসংস্থাগুলির ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকেও সরকারী আওতায় নিয়ে আসা হল। শ্রম-কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কঠোর শৃঙ্খলা আরোপিত হল শ্রমিক-কৃষকদের ওপর, উৎপাদন দ্রুত বাড়ানোর জন্য। যেহেতু তখনও রাশিয়ায় যন্ত্রের ব্যাপক প্রসার হয়নি, সেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে নিবিড় (intensive) শ্রমের প্রয়োগ করা হল। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় জনসাধারণের

শ্রমকে কেন্দ্রীভূত করা হল ব্যাপকভাবে।

শ্রমের এই কেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে উদ্বৃত্ত পণ্য ব্যবহারের রাজনীতিকরণ হল। এ-ব্যাপারে বৈশ্যশাসনের সাথে শূদ্রশাসনের পার্থক্য রয়েছে। দুটি শাসনেই উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদিত হয় সম্পত্তিহীন শ্রমিক-কৃষকের দ্বারা। কিন্তু শূদ্রশাসনে এটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বৈশ্যশাসনের মত প্রধানত পুঁজির সঞ্চয় দিয়ে নয়, বরং এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়া শ্রমের কেন্দ্রীকরণই প্রধান করে তোলে। এই প্রক্রিয়া বৈশ্যশাসনে যে একেবারেই ছিল না তা নয় কিন্তু শূদ্রশাসনের সাথে এর মাত্রাগত পার্থক্য ছিল। এই প্রক্রিয়া তাত্ত্বিক দিক থেকে বৈশ্যশাসনে বৈশ্যশ্রেণীর আর শূদ্রশাসনে শূদ্রশ্রেণীর। কিন্তু এটি ব্যবহারিক দিক থেকে বৈশ্যশাসনে বৈশ্যদের প্রতিনিধিদের আর শূদ্রশাসনে শাসকগোষ্ঠীর। উৎপাদন-ব্যবস্থার চালিকাশক্তি বৈশ্যশাসনে বৈশ্য আর শূদ্রশাসনে রাষ্ট্র; উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সম্পর্কের দ্বন্দ্বকে বাধা দেয় বৈশ্যশাসনে প্রশাসন ও আমলা, শূদ্রশাসনেও তাই। উভয় শাসনের এই রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়াকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে শূদ্রশাসনে রাষ্ট্রের একমুখী নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের কাছে কেন প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় রাষ্ট্রীকরণ ও সমাজীকরণকে একই ব্যাপার বলে মনে করা হল। ফলে শিল্প-শিক্ষা-সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদি সবই গেল রাষ্ট্রের হাতে, এবং জনসাধারণের কোন অধিকার রইল না এগুলিকে নিয়ন্ত্রণের। উৎপাদনের উপকরণ ও ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে ব্যাখ্যা করা হল শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ হিসাবে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ-স্থলগুলি (meeting points) সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় জনসাধারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের একমুখী নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হল এবং এর ফলে তাদের মনে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হতে লাগল।

রাষ্ট্রের বিস্তৃত বাহু সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকায় মানুষকে তার জীবনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হচ্ছে যে-প্রক্রিয়া তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ একটি অমোঘ নিয়ন্ত্রক শক্তি। মানুষ অনুভব করছে এই শক্তির সাথে তার সম্পর্ক একমুখী, এটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাছাড়া ব্রাহ্মণশাসনের মতো মতাদর্শগত প্রভাব শূদ্রশাসনে এতটা গভীর নয় যে মানুষ তাকে বিনা প্রশ্নে স্বেচ্ছায় মেনে নেবে। সে তখন প্রশ্ন তুলছে, কিন্তু কেউ-ই রাষ্ট্রের সামনে এই প্রশ্ন রাখতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে মানুষ দেখছে যে এই

সংকট শুধু সেই অনুভব করছে না, সমাজের অন্তান্তরাও অনুভব করছে। সে তখন এগিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে, প্রতিবেশীর অসহায়বোধ তার মনেও সঞ্চারিত হচ্ছে; ব্যাপক অসহায়বোধ তার চিন্তা ও কর্মশক্তিকে অবশ করে তুলছে। বিবেকানন্দের ভাষায়—"মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া কাজ করে। তাহাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই…। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কিনা মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।"[১৩]

রাষ্ট্রের পরিবর্তন

বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্র জনসাধারণের কাছ থেকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এ-বিষয়টি আমরা দেখলাম। এই বিচ্ছিন্নতাই রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলে। পরিণতিতে ঘটে বিপ্লব।

ব্রাহ্মণশাসনের মূল বৈশিষ্ট্য যেহেতু জ্ঞানের বা মতাদর্শের কেন্দ্রীকরণ, সেহেতু এই শাসনের অবসানের জন্য ক্ষত্রিয়রা আক্রমণ করে এই মতাদর্শকেই। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরা কর্ম মীমাংসার ওপর ভিত্তি করে তাদের দর্শন বা মতাদর্শ গড়ে তুলেছিল। [এই দর্শনের বক্তব্য হল যজ্ঞ ও পুণ্য কর্মের মাধ্যমে স্বর্গলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য; কর্ম বর্ণপ্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট।] উপনিষদের দর্শনে—যা বেদান্ত দর্শন হিসেবে পরিচিত—দেখা যায় এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এটি একদিকে যেমন বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, অন্যদিকে যজ্ঞের বদলে বিচার ও মননশীলতাকে তুলে ধরেছিল। উপনিষদের ঋষিরা অধিকাংশই ছিলেন ক্ষত্রিয়। এরা ব্রাহ্মণ্যধারাকে ক্রমশই অস্বীকার করতে লাগলেন দর্শনের ক্ষেত্রে—দ্বৈতবাদের বদলে অদ্বৈতবাদকে প্রধান করে তুললেন, যজ্ঞ ও উপাসনার বদলে বিচার ও ধ্যানকে, এবং এই সাথে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সমকালীন ভারতে যে ক্ষত্রিয় গণরাজ্যগুলি (ষোড়শ জনপদ হিসাবে খ্যাত) গড়ে উঠেছিল, সেখানে ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান দেখান ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইওরোপে সামন্তরা পোপের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে দাঁড়াতে পেরেছিল তখনই যখন মার্টিন লুথার পোপ-বিরোধী মতবাদ প্রচার করলেন। এই মতবাদ ছিল রোমান ক্যাথলিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণশাসনে শোষণের মূল যেহেতু জ্ঞান বা মতাদর্শ, সেহেতু ক্ষত্রিয়েরা এই মতাদর্শের বিরুদ্ধেই প্রধান আঘাত হানে। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, একটি শাসনের অবসান ঘটানোর জন্ম দুটি প্রক্রিয়ার আবির্ভাব ইতিহাসে লক্ষ্যণীয়—প্রথমত, শোষণের মূল শক্তিকে আক্রমণ করা ; এবং দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের সহায়তায় অন্ত একটি শ্রেণীর উঠে আসা নেতা হিসাবে। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ-মতাদর্শকে আঘাত করেছিল, কিন্তু যতদিন না ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণশাসনকে পুরোপুরি আঘাত করেছে ততদিন ব্রাহ্মণ প্রভাবকে পুরোপুরি জয় করতে পারে নি। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, হিন্দু রাজারা পুরোহিতদের সম্পূর্ণ দমন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই একচ্ছত্র হিন্দু রাজার উদাহরণ ভারতীয় ইতিহাসে কম, এবং পুরোহিতদের দমন করতে পেরেছিল বলেই বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজারা অনেকেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সুবিধা পেয়েছিলেন। শুধু রাজাদের ঐক্যই নয়, ব্রাহ্মণশাসনের অবসানের জন্ম জনসাধারণের সমর্থনও দরকার। ভারতে বুদ্ধদেব সফল হলেন, কারণ তিনি মানুষকে ব্রাহ্মণ্যধারার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করতে পেরেছিলেন এবং এ-বিষয়ে জনসাধারণ তাকে প্রভূত সমর্থন জানিয়েছিল।

ক্ষত্রিয়শাসনের মূল শক্তি অস্ত্র এবং এর সাহায্যেই শোষণ চলে। বৈশ্যরা এই অস্ত্রশক্তিকে দুর্বল করে দেয় নিজেদের অর্থশক্তি দিয়ে (বৈশ্যের মূল শক্তি হল অর্থ)। বৃটিশরা ভারতে এসে যে-সব যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তাতে সামরিক কুশলতার চেয়ে উৎকোচ ও ষড়যন্ত্রই বড় ভূমিকা নিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ থেকে মহীশূরের যুদ্ধ পর্যন্ত এটাই ছিল বৃটিশ বৈশ্যদের প্রধান রণকৌশল। ভারতে কিছুটা স্থিতিলাভ করে বৃটিশ প্রথমেই সামন্তদের সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে সমন্ত-প্রভুরা ক্রমশই নিজস্ব জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিল ব্যবসায়ীদের কাছে যার ফলে সামন্তদের সেনাবাহিনীও দুর্বল ও ছোট হয়ে পড়েছিল। শিল্পবিপ্লব ও নগরের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদীয়মান বুর্জোয়ারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পার্লামেণ্ট গঠনের মাধ্যমে জনগণের ব্যাপক অংশকে নিজেদের সহযোগী করে তোলে। ওদিকে ক্ষত্রিয়শক্তির মূল অবলম্বন যে অস্ত্র তা আরও দুর্বল হয়েছিল সেনাবাহিনীর মানসিকতার জন্ম। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ভাড়াটে সৈন্যদের আনুগত্য কোন নির্দিষ্ট রাজার প্রতি থাকে না, যে বেশি টাকা দেবে তার প্রতি তাদের আনুগত্য। ইওরোপে এজন্যই গৃহ-বিপ্লবে সৈন্যবাহিনী তাদের রাজা বা

সামন্ত-প্রভুদের বাঁচাতে বিশেষ চেষ্টা করে নি।

বৈশ্যশাসনের মূল শক্তি যেহেতু পুঁজি সেহেতু এই শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী মূল আঘাত হানে পুঁজির ওপর। রাশিয়া ও চীনে দেখা গেছে বিপ্লবের পর নতুন শাসকগোষ্ঠীর প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এটিই। এবং দলের (party) অধীনে মানুষকে সম্মিলিত করা গিয়েছিল বলেই এটি সহজ হয়েছিল কারণ জনসাধারণও পুঁজির বিরুদ্ধে আক্রমণকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চেয়েছিল।

শূদ্রশাসনে ঘটে শ্রমের কেন্দ্রীকরণ। ফলে মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলিতে যে বিদ্রোহ দেখা যায় তার প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণ। কৃষক ও শ্রমিকের স্বাধীন জীবিকার দাবি—যা ব্যক্তিগত জোতের দাবি এবং স্বাধীন ট্রেড-ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের দাবির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে—এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে মানুষের স্বেচ্ছা সংগঠনের দাবি ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। রাশিয়া ও অন্যান্য মার্কসবাদী রাষ্ট্রে এই প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। শূদ্ররাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে এটা মেনে নেওয়া কঠিন কারণ এই শাসন দাঁড়িয়ে আছে জনসাধারণের শ্রমের কেন্দ্রীকরণের ওপর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সব রকম শাসনেই বিপ্লবী শক্তি আঘাতটা হানতে চায় রাষ্ট্রের মূল শক্তির ওপর। ব্রাহ্মণশাসনে জ্ঞান বা মতাদর্শ, ক্ষত্রিয়শাসনে অস্ত্র, বৈশ্যশাসনে অর্থ ও শূদ্রশাসনে শ্রমের কেন্দ্রীকরণ ঘটে। এবং বিশেষ-শাসনে বিপ্লবীরা এই বিশেষ শক্তিকেই ধ্বংস করতে চায় জনসাধারণের সহায়তা নিয়ে। কিন্তু এ-সত্ত্বেও—বিদ্রোহ-বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও, রাষ্ট্রব্যবস্থা হাতবদল হলেও—কেন বার বার সেই একই সমস্যা দেখা দেয়? বিপ্লবী শক্তি সাফল্য লাভের পর প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত হয় কেন? কেন রাষ্ট্রব্যবস্থা পালটিয়েও রাষ্ট্রের সাথে জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতার সমাপ্তি ঘটান যায় না? এর কারণ পরিচালিকা শ্রেণী পূর্বতন রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌল শক্তির অবদমনকেই বড় করে দেখে ও সেই শক্তির অবদমন ও ধ্বংস চায়। এবং এই চিন্তার বাইরে যেতে চায় না বলে শোষণের মৌল প্রবণতার উচ্ছেদ হয় না, নতুন শাসনে ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, শূদ্রশাসনে নতুন রূপে শোষণ দেখা গেল কারণ বিপ্লবীরা ও শ্রমিক নেতারা বুঝতে পারেন-নি যে পুঁজিবাদী সমাজের সব সংঘাতই পুঁজি থেকে উৎপন্ন নয়, এর বেশ কিছু এসেছে পূর্ব-পূর্ব সমাজব্যবস্থা থেকে। ফলে শুধুমাত্র রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণ করে

শোষণের পুরো চরিত্র নির্ধারণ করে শোষণের পুরো চরিত্র বোঝা যাবে না। বিচ্ছিন্নতার হদিস পেতে হলে সমাজের বিভিন্ন মাত্রা ধরে সমাজ মানসিকতার স্বরূপটি বা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সংযোগ-বিন্দুগুলির অবস্থা বিচার করতে হবে।

বিপ্লবে কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিলে মূল শক্তির উচ্ছেদ হতে পারে, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্নতা ও শোষণের যে নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে সেগুলিকে ধরা যায় না। ব্রাহ্মণশাসন তাই মৌল চরিত্র বজায় রেখেও প্রাচীন ভারতে, মধ্যযুগীয় ইওরোপে, এবং আধুনিক আরবীয় রাষ্ট্রগুলিতে নানান বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছে: ইওরোপের ক্ষত্রিয়শাসন প্রথমদিকে দাসপ্রথার ওপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু ভারতের ক্ষত্রিয়শাসনে এ-ধরণের দাসপ্রথা দেখা যায় নি, যদিও দুই ক্ষেত্রেই শাসনের মৌল চরিত্র ছিল একই রকম। তাই শুধু রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নয়, বিচ্ছিন্নতার সামগ্রিক চিত্র বোঝার জন্য দরকার দেশ-কাল-পরিস্থিতির বিচার। এবং এই বিচারকে নিয়ে যেতে হবে সমাজের গভীরে। আর এ-জন্যই সমাজবিপ্লবের ওপর জোর না দিয়ে শুধু রাষ্ট্র-বিপ্লব করলে মানুষ তার লক্ষ্যের দিকে সঠিকভাবে যাত্রা করতে পারবে না।

ব্যক্তি মানুষের ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে জনসাধারণের ভূমিকা কি? তারাই কি ইতিহাস গড়ে, অথবা ইতিহাস তৈরী হয় নেতাদের দ্বারা? কার্লাইল বিশ্ব-ইতিহাসকে মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস হিসাবেই ধরেছেন। নীৎসে'র মতে অতিমানব বা সুপার-ম্যান-ই ইতিহাসের স্রষ্টা। বিপরীতদিকে ফরাসী ইতিহাসবিদ থিয়েরী, গিজো, মিগনেৎ লিখেছেন, জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপই ইতিহাস। মার্কস-লেনিনও জনসাধারণের ওপর জোর দিয়েছেন যদিও তাঁদের মতে এই জনগণের অর্থ কারখানার শ্রমিক। এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজীর মতে, জনসাধারণ ও নেতা মিলে ইতিহাসের ভাগ্য নির্ধারণ করে। সমাজ-পরিবর্তনে নেতার যে বিশেষ ভূমিকা আছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "ইতিহাস পড়ে দেখ, এক একজন মহাপুরুষ এক-একটা সময়ে এক-একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।"[১৪] অর্থাৎ নেতার একটা

বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা কি ও কতখানি? স্বামীজীর উপরোক্ত উক্তিতে "কেন্দ্রস্বরূপ" শব্দটি রয়েছে। আর বৃত্ত ছাড়া তো কেন্দ্র থাকতে পারে না। এই বৃত্তটি কি? জনসাধারণ। স্বামীজীর ভাষায়—"জগতের যা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে।"[১৫] ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, নেতা তখনই সার্থক হয়েছেন যখন তিনি জনসমর্থন পেয়েছেন। অর্থাৎ জনসাধারণেরও একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত প্রথম উক্তিতে স্বামীজী "যেন কেন্দ্রস্বরূপ" শব্দগুলির "যেন" শব্দের মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছেন? সমাজ জেগে উঠলে জনসাধারণের মধ্য হতেই কেউ কেউ নেতা হিসাবে উঠে আসেন। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় নেতাই সমাজকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মূল শক্তিটা আসে সমাজ থেকেই। নেতাকে মধ্যমণি বা কেন্দ্র মনে হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে "যেন কেন্দ্রস্বরূপ"।

সমাজের শক্তির অর্থ ঐ সমাজের জনসাধারণের শক্তি। এই শক্তিকে কিছুকাল চেপে রাখলে তা সেই বিরোধী চাপকে জয় করে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। যদিও ঐ শক্তি মূলত সমাজের শক্তি তবুও তার প্রকাশ ঘটে প্রথম দিকে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে বা নেতার মাধ্যমে। নেতা ঐ প্রকাশকামী শক্তির প্রতীক।

সমাজের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মূল শক্তি জনসাধারণের। সমাজের নেতৃত্ব যার হাতেই থাকুক, সেই নেতাকে নির্ভর করতেই হয় সাধারণ মানুষের ওপর। কিন্তু আত্মিক ব্যাপারটি ঠিক এ-রকম নয়, এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষকেরা উৎসাহী ও সক্রিয় না হলে হাজার সরকারী সাহায্যেও সবুজ বিপ্লব ঘটত না। জনসাধারণ সতর্ক না হলে গণতন্ত্র রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ-জগদীশ বসু-তানসেনের অবদান এ রকম পুরোপুরি জনসাধারণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে নেই। এঁরা জনগণ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভায় নতুন অবদান রেখে গেছেন। অবশ্য নিজেদের এই প্রতিভাকে সমাজে ক্রিয়াশীল করতে হলে অথবা এর দ্বারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে জনসাধারণের সাহায্য দরকার হয় এঁদের পক্ষেও।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল সামাজিক পরিস্থিতিতেই। ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তৎকালীন যুগে চলছিল। রামমোহন-দয়ানন্দ—

রাভাৎস্কি প্রমুখ মনীষী এ-প্রসঙ্গে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তর খুঁজছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে এই উত্তরই পরিণতি পেল। ধর্মকে সমাজসেবার কাজে লাগানোর প্রয়াস স্বামীজীর আগে দেখা গিয়েছিল আর্যসমাজ-ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে। কিন্তু এ যে খৃষ্টান মিশনারীদের অনুকরণ নয়, বরং আধ্যাত্মিক সাধনারই অঙ্গ, এটি প্রকাশ করলেন স্বামীজী। যারা মনে করেন স্বামীজী খৃষ্টান মিশনারীদের অনুকরণ করেছিলেন তারা যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করেন তবে বুঝতে পারবেন যে সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাজসেবার আদর্শ খৃষ্টানদের বহু আগেই দেখিয়েছেন ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণেরা।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা হল তাতে দুটি বিষয় আমরা পেলাম। প্রথমত, নেতা স্বয়ম্ভূ নন, সমাজের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্খার পরিণতি তিনি। তাঁর চিন্তা ও কাজ জনসাধারণেরই শক্তি ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। পূর্বগামীদের প্রয়াস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁকে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, সমাজের বাস্তব গতির সাথে তাঁর মিল থাকে, এবং তিনি সাধারণের চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পান। যুগের প্রয়োজন ও লক্ষ্যকে তিনি প্রকাশ করেন। এই দুটি কারণে সামাজিক প্রেক্ষাপট বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ না করলে নেতাকে পুরোপুরি বোঝা যায় না।

নেতা কি করেন? স্বামীজী বলেছেন, জনতা সাধারণ অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ থাকে না, বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে বলে মূল সমস্যাকে সঠিকভাবে ধরতে পারে না এবং সামাজিক শক্তিকে কিভাবে প্রয়োগ করবে সেটি ভালভাবে বুঝতে পারে না। নেতা ঐ উদ্দেশ্য ধরিয়ে দিয়ে জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করেন যাতে সামাজিক শক্তি ঠিকপথে প্রকাশিত হয়। তিনি সমাজের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমাজের মৌল প্রবনতাটি বুঝতে পারেন এবং মানুষকে সে-বিষয়ে সচেতন করেন।

নেতার সাফল্য ও ব্যর্থতা কিসের ওপর নির্ভর করে? যুগের বিষয়গত পরিস্থিতি, লক্ষ্য, সম্ভাবনা ও দূরদৃষ্টির ওপর! সমাজের পরিস্থিতি-লক্ষ্য-সম্ভাবনার মূল্যায়ন করতে পারা এবং কোন্ শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে তা নির্ণয় করতে পারা নেতার সাফল্যের কারণ। নেতা কিছু চাপিয়ে দেন না, পরিবর্তনের সম্ভাবনা পরিপক্ক হয়ে না উঠলে নেতা এককভাবে কিছু করতে পারেন না। জনসাধারণ যদি নিজেদের উন্নতির জন্য জাগ্রত না হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন

থাকে তবে নেতা ব্যর্থ হন। তাই নেতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য জনতার ব্যক্তিত্ব জাগ্রত করা। জনসাধারণ যত বেশি সক্রিয় হবে, নেতা ততই সফল হবেন। এজন্য স্বামীজী লিখেছেন "যে নতুন শক্তিতে···নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে সেই লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন করো।"[১৬] জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠলে নেতা সেই শক্তিকে সুনির্দিষ্ট গতি দেন। নেতার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন উপাদান একত্র হয়ে গতির সঞ্চার হয়।

এভাবে জনসাধারণই নেতাকে তৈরী করে যদিও নেতার ব্যক্তিগত ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। রাশিয়ায় স্টালিনের বদলে কেরেনস্কি বা ট্রটস্কির হাতে ক্ষমতা থাকলে ইতিহাস একই পথে যেত না, স্বাধীনতার পর নেহেরুর বদলে নেতাজী প্রধানমন্ত্রী হলে ভারতের অবস্থা অন্যরকম হত।

নেতা কিভাবে কাজ করবেন? প্রকৃত নেতা কাজ করবেন অনুঘটকের (catalyst) মতো যাতে জনসাধারণ আরও বহু নেতাকে গড়ে তুলতে পারে এবং নিজেরাই এগিয়ে আসে। "জনগণের দ্বারা জনগণের মুক্তি সাধন" চেয়েছিলেন স্বামীজী।

অর্থাৎ জনসাধারণ দাঁড় চালাবে নৌকার, নেতা হাল ধরে থাকবেন—এই ছবিটিই আমাদের মনে ভেসে ওঠে উভয়ের সম্পর্কে। তবে সবসময় একজনই হাল ধরে থাকবে এটি স্বামীজী চাননি। বরং জনসাধারণ নৌকার দাঁড় বাইবে এবং ওদের মধ্য থেকেই একজন উঠে এসে হাল ধরবে, কিছুক্ষণ পর তার বদলে আরেকজন হাল ধরবে। এভাবে জনসাধারণের মধ্যে অধিক থেকে অধিক সংখ্যায় নেতা তৈরী করে সমগ্র সমাজকে শক্তিশালী করার কথা বলেছেন স্বামীজী।

পাঁচ ঃ ব্যক্তিমানস-সমাজমানস

বর্তমান সামাজিক অবস্থায় ব্যাপক সুবিধাবাদ দেখে অনেকেই চিন্তিত। সমাজবিজ্ঞানীরা একে বিশ্লেষণ করছেন, সাংবাদিকেরা অনাচারের কথা তুলে ধরছেন, সমাজসেবীরা গঠনমূলক পথে কিছু কাজ করে যাচ্ছেন। এই অনাচারের জন্য কেউ দায়ী করছেন রাজনীতিবিদদের, কেউবা বুদ্ধিজীবীদের, আবার অনেকে সমাজব্যবস্থাকেই ত্রুটিপূর্ণ বলে সাব্যস্ত করছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলিও নানারকম আন্দোলন করছে—কখনও পণ্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, কখনও বিহার প্রেসবিলের বিরুদ্ধে, কখনও বা যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলি লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে এক Establishment-কে বদলে আর এক Establishment-এর আবাহন করে আনা হচ্ছে। রাশিয়া, চীন, ইরাণ, বাংলাদেশ, ভারত ইত্যাদি দেশে ব্যবস্থা পাল্টে বা সরকার বদলিয়ে কিছুটা ভাল দিক দেখা গেলেও নতুন যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা সময়-সময় আরও মারাত্মক হয়ে উঠছে।

সমাজ দাঁড়িয়ে আছে মানুষের আন্তঃ সম্পর্কের ওপর—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক, ব্যক্তিতে গোষ্ঠীতে সম্পর্ক, এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্থার সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলি আবার দুই ধরণের—বিষয়গত (objective) এবং বিষয়ীগত (subjective)। সমাজে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে সম্পর্কগুলি দরকার হয় সেগুলি বিষয়গত সম্পর্ক, যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থার নানান স্তরবিন্যাস, পারিবারিক সম্পর্ক, খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদির চাহিদা-যোগানের সম্পর্ক, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বিষয়ীগত সম্পর্ক হল সেগুলিই যে-সব সম্পর্ক মানুষ গড়ে তুলেছে ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী, যেমন বন্ধু, ক্লাব, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি।

বিষয়গত সম্পর্ক

এই সম্পর্ক যেসব বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠে তার মধ্যে আছে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি। এগুলির প্রতি মানুষ দু'ভাবে সাড়া

দেয়। প্রথমত, সামাজিক ব্যবস্থায় সে নিজেকে কতখানি সহযোগী করতে পারছে। দ্বিতীয়ত, তার দক্ষতা ও কর্মের ফলে সে কতটা বেশী লাভবান হচ্ছে। প্রথমটির ফলে মানুষ চলতি মূল্যবোধে অভ্যস্ত হতে চায়, এবং দ্বিতীয়টির দরুন সে স্কুল-জীবন থেকেই স্বপ্ন দেখে ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হবার। সামাজিক স্বীকৃতির প্রতি অনুরাগ এভাবেই গড়ে ওঠে।

ইঞ্জিনীয়াররা নতুন যন্ত্র বা মেসিন তৈরী করার সময় লক্ষ্য রাখেন নির্দিষ্ট প্রয়োগ (input) থেকে কতটা বেশি ফল (output) পাওয়া যায়; এই অনুপাতের ওপরই নির্ভর করে মেশিনের কর্মদক্ষতা (efficiency)। সাধারণ মানুষও তাঁর বিষয়গত সম্পর্কের ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি নেয়। সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে তাকালে বিষয়টি বোঝা যাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে; আর কারখানার মালিক-শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

বিষয়গত সম্পর্কের প্রতি মানুষ যে দু'ভাবে সাড়া দেয় তার ফলে একদিকে যেমন মানসিক নির্ভরতা (psychological dependence) গড়ে ওঠে, অন্য-দিকে প্রতিযোগিতার (competition) ভাবও তৈরী হয়। এবং এই মনোভাবের উৎস পারিবারিক ক্ষেত্রেই। Careerism ও ভোগবাদের বীজ কিভাবে বাল্যকাল থেকেই সবার মধ্যে সঞ্চারিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি।

এই Careerism ফলেই রাজনৈতিক অনাচারের ব্যাপকতা এদেশে। রাজনৈতিক দলগুলিতে মানুষ সদস্য হচ্ছে বা সমর্থক হচ্ছে নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, বুদ্ধিজীবীরা এ-কারণেই রাজনৈতিক সংগঠনকে মদত দিচ্ছেন, আই-এ-এস এবং আই-পি-এস অফিসারেরা রাজনৈতিক অন্যায় দেখেও তার সহযোগী হচ্ছেন। বিপরীত দিকে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসক নেতারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও পাইয়ে দেবার রাজনীতি করে চলেছেন। Establishment কখনও চায় না তার স্থিতিকে অনিশ্চিত করে তুলতে; সেজন্য সম্ভাব্য শক্তিজোটগুলিকে কিছু পাইয়ে দিয়ে সেগুলিকে সে নিজস্ব Establishment-এর শরিক করে তুলতে চায়। এবং এভাবেই আজ দেশে ধনী ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে।

বিষয়গত সম্পর্ক মানুষের জীবনে কিছুটা দরকার। কিন্তু এই সম্পর্ক যখন

মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, প্রয়োজনীয় সম্পর্কের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলে মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে, তখনই তা ক্রমশঃ বিপর্যয় ডেকে আনতে থাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারে বিলাসদ্রব্য এভাবেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় স্থান পায়। টি. ভি., ফ্রীজ, কসমেটিক্স্, দামী কাপড় ও শাড়ি ইত্যাদি তখন তাদের কাছে আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়, দাবি ওঠে বেতনবৃদ্ধি ও বোনাস বৃদ্ধির।

বিষয়ীগত সম্পর্ক

আগেই বলা হয়েছে, বিষয়ীগত (subjective) সম্পর্ক মানুষ গড়ে তোলে ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী। ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রেমিক-প্রেমিকা, লিট্ল্ ম্যাগাজিনের সাহিত্যিক গোষ্ঠী ইত্যাদি এর উদাহরণ। এসব সম্পর্কের পেছনে থাকে সামাজিক স্বীকৃতির আকুতি, সম্পর্কের লাভ ক্ষতির হিসেব তত্টা থাকে না।

এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটি মানুষের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে "A man is known by the company he keeps" কিংবা "একজন কি ধরণের বই পড়ে তা দেখে বলা যায় মানুষটি কেমন।" এ ধরণের বিষয়ীগত সম্পর্ক মানুষ গড়ে তোলে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী।

এবারে এই বিষয়ীগত সম্পর্ককে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মানুষ একজনকে পছন্দ অন্যকে অপছন্দ করে কেন? আসলে মানুষ সে-ধরণের সম্পর্কই গড়ে তোলে যা তাকে আনন্দ দেয়, তৃপ্তি ও নির্ভরতা দেয়। যে-সম্পর্ক এগুলি দেয়না সেই সম্পর্ককে মানুষ এড়িয়ে চলে। এবং এভাবেই মানুষ নিজের চারদিকে দেওয়াল তোলে। এই দেওয়াল (wall) দুই ধরণের —মানসিক ও বস্তুগত। একজনকে ভাল করে না জেনেই কেউ যখন তাকে এড়িয়ে চলে তখন মানসিক দেওয়াল গড়ে ওঠে, আর আদর্শগত-জাতীয়তাবাদী-অর্থ নৈতিক-সামাজিক মতভেদের দরুণ বস্তুগত দেওয়াল গড়ে ওঠে। এই দুটিই মানসিক, বস্তুগত ব্যাপারটিও ভাবাদর্শগত।

বিষয়ীগত সম্পর্ক প্রায়ই মানুষের অজান্তে বিষয়গত সম্পর্কে পরিণত হয়। যেমন মা-বাবা তাদের ছেলেকে ভালবাসেন অন্তর থেকেই, কিন্তু সেই ছেলে যতই বড় হতে থাকে ততই মা-বাবা তার কাছ থেকে প্রতিদান আশা করতে থাকেন—প্রথমে আশা করেন ছেলে ইলেকট্রিকের বিল জমা দিয়ে

আসবে, বাজার করে দেবে, তারপর আশা করেন বিয়ের ব্যাপারে সে তাদের কথা শুনবে, এবং পরে বৃদ্ধবয়সে তাদের দেখাশোনা করবে। বন্ধুদের মধ্যে, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেও এ-রকম দেখা যায়।

সমাজে যে প্রজন্মগত ব্যবধান দেখা যায় তার মূল কারণ নিহিত পারিবারিক ক্ষেত্রেই। একটি শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার আত্মপ্রকাশের ঝোঁক বাড়ে। এভাবে পরিবারে যে নতুন শক্তির ক্রম অভ্যুদয় ঘটে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা-বাবা সেটাকে মেনে নিতে পারেন না বা সে-বিষয়ে সচেতন থাকেন না। অভিভাবকসুলভ কর্তৃত্ব দিয়ে তারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতেই সবকিছুর মূল্যায়ন করতে চান। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সমাজে এবং পরে রাষ্ট্রনীতিতে। ভারতের রাজনীতিতে এই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ রেখেছেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বসিরুদ্দিন আহমেদ তাঁর "রাজনৈতিক বিশ্বাসের রূপান্তর"[১] প্রবন্ধে। একই বিষয় দেখা গেছে বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও। নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের নিরপেক্ষ নীতিকে ভুল বুঝেছিল রাশিয়া ও আমেরিকা। পরে মিশর, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি দেশের সহযোগে নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্ব জোরদার হয়ে উঠলে বৃহৎ শক্তিগুলি এদের মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বৃহৎ শক্তিগুলি যে নতুন প্রকাশোন্মুখ শক্তি বা চেতনাকে এখনও মেনে নিতে পারছে না তার প্রমাণ হল হাঙ্গেরী-চেকোশ্লোভাকিয়া-আফগানিস্থান-পোলাণ্ডে রাশিয়ার খবরদারি।

বিশ্ব-রাজনীতিতে বারবার সংঘর্ষ বাধছে বিষয়গত সম্পর্কের জন্য। সেই-সাথে বিষয়ীগত সম্পর্কেও বিদ্বেষ বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। এগুলিকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি—

বিষয়গত সম্পর্ক : বর্তমানে সহাবস্থানের ভিত্তি স্থাপিত নিরাপত্তার আশংকার ওপর। ন্যাটো এবং ওয়ারশ চুক্তি এরই বহিঃপ্রকাশ। সেইসাথে বৃহৎ শক্তিগুলি নিজেদের চারদিকে অনুগত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাইছে। এ-সবের ফলশ্রুতিতে নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই নিত্য নতুন মারণাস্ত্র তৈরী করে নিজেদের ও বিপক্ষের স্নায়ুর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে।

বিষয়ীগত সম্পর্ক : রাশিয়ার শিশুকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মনে মার্কিন-বিদ্বেষ এবং বিপরীত দিকে আমেরিকার প্রবল প্রচারের সাহায্যে রুশ-বিদ্বেষ ছড়ান হয়। এর ফলে দেশ দুটি মুখে যতই

শান্তির কথা বলুক, অন্তরে উভয়েই প্রবল ঘৃণা পোষণ করে। অতএব এই শান্তির বাণী নিছক কূটনৈতিক চালের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে কারণ জনসাধারণের মন থেকে ঘৃণার বীজ লুপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে না।

এই সমস্যা দূরীকরণে আমরা এখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মত আলোচনা করতে পারি। তিনি চেয়েছিলেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাধ আদান-প্রদান চলুক বিভিন্ন জাতির মধ্যে। প্রত্যেক দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন দেশে যাক, ভাবের আদান-প্রদান চলুক সর্বক্ষেত্রে। প্রতিটি জাতির সংস্কৃতিকে দুটি দিক থেকে দেখার কথা বলেছিলেন বিবেকানন্দ। প্রথমত, একটি দেশের বৈশিষ্ট্যের (national characteristics) ওপর ভিত্তি করেই সেই দেশের সংস্কৃতিকে বুঝতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্বের সামগ্রিক মানবসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সে-দেশের সংস্কৃতির অবদান বুঝতে হবে। এভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠে সন্ধান দেবে সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের, নতুন বিশ্ব-সংস্কৃতির।

যুদ্ধকে বিদায় দেবার জন্য মানুষকে শেখাতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তব্যের মর্মকথা। এক সময়ে বহুল ব্যবহৃত দ্বন্দ্বযুদ্ধ (duel fight) যেমন বর্তমানে মধ্যযুগীয় ছেলেমানুষী বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহকেও শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করা হবে এমন এক যুগে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সময় সাপেক্ষ হলেও এই নতুন দর্শনের প্রচারের কাজ শুরু করে দিতে হবে। যুদ্ধ মানুষ করে শুধু লোভের বশবর্তী হয়েই নয়, সে মনে করে বিরোধী পক্ষ ধ্বংস হয়ে গেলে বিশ্বের কোন ক্ষতি হবে না; অন্যের সাংস্কৃতিক অবদান সম্বন্ধে সে অনবহিত বলেই সে অন্যের সংস্কৃতিকে মূল্যবান মনে করে না। আজ ইস্রায়েল মনে করে না আরব-সংস্কৃতির কোন মূল্য আছে, কমিউনিস্টরা মনে করে না ইওরোপ আমেরিকার গণতান্ত্রিক চেতনার কোন প্রয়োজন বিশ্ববাসীর আছে, আমেরিকাও বুঝতে পারে না মার্কসীয় মতবাদের অবদান কি। নাদির শা, আওরঙ্গজেব কখনও বোঝেননি হিন্দু-সংস্কৃতির উজ্জ্বল দিক, রাজা আর্থার বোঝেননি ইসলাম-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—সেজন্য এরা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন বিরোধী দলের সংস্কৃতিকে।

অতএব সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ওপর জোর দিতে হবে। বর্তমানে

এটি এক ধরণে চলছে ঠিকই—সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা (Cultural Delegate) বিভিন্ন দেশে গিয়ে নাচ-গান করছেন—কিন্তু এ চলছে যান্ত্রিকভাবে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে এরা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারছেন না কোন জীবনদর্শনের অভাবে। স্বামী বিবেকানন্দের যে দুটি বক্তব্য আমরা আলোচনা করেছি সেই বক্তব্যকে সামনে না রেখে যদি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের আদান-প্রদান করা যায় তবে তা নিছক সাংস্কৃতিক বিনোদনে পরিণত হবে। সঠিক কর্মপন্থা হল প্রথমেই প্রতিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা।

গবেষণা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য

এই সব সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে প্রধানত ছয়টি।

(১) বিশ্ব-পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার পর্যালোচনা।

(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহুল প্রসারে মানুষের মানসিক গঠন ও সমাজ কাঠামো কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার অনুসন্ধান।

(৩) মানবতার মানদণ্ডে কোন্ দেশ কোন স্থানে এবং উন্নততর অবস্থা লাভের জন্য বাস্তব প্রণালীর অনুসন্ধান।

(৪) বিভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের পরিপূরক—এই সূত্র সামনে রেখে সমগ্র মানব সংস্কৃতির পর্যালোচনা।

(৫) সামাজিক, ধর্মীয়, দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য কি এবং এদের গঠনমূলক সমন্বয়ের জন্য সূত্র আবিষ্কার।

(৬) নতুন আন্তর্জাতিকতার সন্ধান—প্রতিটি দেশ কিভাবে জাতীয়তা-বোধ বজায় রেখেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে।

কর্মপ্রণালী

(১) প্রতিটি গবেষণা-কেন্দ্রেই বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী থাকবে।

(২) দেশের রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক প্রমুখ বিভিন্ন স্তরের লোকের সাথে এই কেন্দ্রগুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে হবে যাতে কেন্দ্রগুলি বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং দেশের রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক,

শিক্ষক ও অভ্যাস্তরা এই গবেষণার তত্ত্বগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন।

(৩) পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভি, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে এসব গবেষণার উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

(৪) রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রতিরক্ষামূলক জোট নয়, সব দেশকে নিয়ে সাংস্কৃতিক জোট (cultural Commonwealth) গড়ে তুলতে হবে।

(৫) ব্যবহারিক দিক দিয়ে বর্তমান পৃথিবীর তিনটি সংকট সম্বন্ধে গভীর চিন্তা ও তার বাস্তব সমাধানের জন্ম প্রয়াস চালাতে হবে। প্রথম সংকট-ভাবরাজ্যে ও ব্যবহারিক জগতে মানুষের নিঃসঙ্গতা-বোধ, অসীম শূন্যতা, ও বিচ্ছিন্নতার ভয়। দ্বিতীয়ত, চিন্তা-কথা-কাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি। তৃতীয়, নৈতিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য না দেওয়ায় মানুষের মনুষ্যত্ব দিশেহারা।

বিশ্বের বিভিন্ন সংকটের পেছনে অর্থনৈতিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা এক ধরণের কুসংস্কার। আমেরিকা-ইওরোপের ধনী দেশগুলিতে যে সংকট দেখা যাচ্ছে তার পেছনে অর্থনীতিই সব নয়। বিখ্যাত মার্কিন নিগ্রো নেতা প্রয়াত ম্যাল্কম্-এক্স লিখেছিলেন—"I tell sincere white people, 'work in conjunction with us'—each of us working among our own kind.···Let sincere whites go and teach non-violence to white people···We will completely respect our white co-workers. They will deserve every credit. In our mutual sincerity we will be working together. In our mutual sincerity we might be able to show a road to the salvation of America's very soul. It can only be salvaged if human rights and dignity, in full, are extended to black men. Only such real meaningful actions as those which are sincerely motivated from a deep sense of humanism and moral responsibility can get at the basic causes that produce the racial explosions in America today."[২]

ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট বলে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার যে প্রবণতা তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। রাশিয়ার স্কুলের ছেলেমেয়েদের

মধ্যে যে ব্যাপক যৌন-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, চীনে বিয়েতে পণপ্রথা আজও চলেছে—এসব কথা ঐসব দেশের সরকারী পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনীতিই সব নয়, সংকট আরও গভীরে। মূলত, পারিবারিক সূত্র যত বিচ্ছিন্ন হতে থাকে ততই মানুষ খণ্ড-ব্যক্তিত্বের দিকে এগিয়ে চলে। ২৫ ৯-৮২ তারিখে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শিশু শ্রমিকদের অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ততই তারা নিষিদ্ধ বিনোদনের দিকে ঝোঁকে। ঐ প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য উল্লেখ করলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।

পরের পৃষ্ঠাতে প্রদত্ত ছক থেকে দেখা যায় অর্থনৈতিক অবস্থার থেকে মানসিক অবস্থা মূল ভূমিকা নেয়, এবং মানসিকতার পেছনে পারিবারিক অবস্থা ও শিক্ষা কাজ করে। এটি শুধু কলকাতার শিশু-শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই নয় ধনী দরিদ্র-গণতন্ত্রী-সাম্যবাদী সব দেশের মানুষদের ক্ষেত্রেই সত্যি।

ব্যক্তিমানস-সমাজমানস

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হল তাতে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে পারিবারিক ক্ষেত্র। পারিবারিক সমস্যার সাথে অন্যান্য সমস্যাগুলির পার্থক্য পরিমাণগত, গুণগত নয়। এবং এই পারিবারিক দ্বন্দ্বের পেছনে আছে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ বিষয়ীগত সম্পর্ক ব্যাপক প্রভাব ফেলছে বিষয়গত সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

বিষয়ীগত সম্পর্ক বিষয়গত সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। সেজন্য বিষয়ীগত সম্পর্কের পরিবর্তন করতে না পারলে সমাজব্যবস্থা পালটিয়েও কিছু হবে না কারণ আইন বা দণ্ডের সাহায্যে বেশিদূর যাওয়া যায় না। জেল থেকে বেরিয়েও চোর-ডাকাতের চরিত্র এ-কারণেই বদলায় না।

মনে হয় মার্কস্ এ জায়গাতেই ভুল করেছিলেন। উৎপাদন-সম্পর্ক বিষয়গত সম্পর্কগুলির অন্যতম, কিন্তু তিনি সেটিকেই সব ধরেছিলেন। এই একদেশী দৃষ্টি তাঁর দর্শনকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারে নি। কয়েকজন সমাজ-বিজ্ঞানী বিষয়গত সম্পর্কগুলি ধরে বিচার করলেও সমাজগতির (social dynamics) ব্যাপারে তারা বিষয়ীগত সম্পর্ককে তেমন গুরুত্ব দেন নি। অথচ বর্তমান সমাজ তথা রাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সেজন্য ঐ মুষ্টিমেয় লোকদের গণনায়

পেশা	দৈনিক শ্রম	শিক্ষা	পারিবারিক সম্পর্ক	বিনোদন
রেস্তোঁরার বয়	১৪ ঘণ্টা	নিরক্ষর	পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন	জুয়ো খেলা
জুতো-পালিশ	১২ „	„	„	„ মদ
গাড়ি ধোওয়া	১৪ „	„	„	নেশা করা
দোকান কর্মী	৮ „	ক্লাস ফোর	মার সাথে ঘনিষ্ঠ	ক্যারাম খেলা
কাঁচ কলের কর্মী	৮ „	নিরক্ষর	বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ	হিন্দী সিনেমা
টেম্পোর খালাসী	১৪ „	কিছুটা জানে	মার সাথে ঘনিষ্ঠ	„
দর্জি দোকানে	১৪ „	নিরক্ষর	পারিবারিক সম্পর্ক ভাল	নেই
কসাইখানা	৬ „	নিরক্ষর	পারিবারিক সম্পর্ক খারাপ	মদ

না এনে শুধু বিভিন্ন শক্তিজোটের বিশ্লেষণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে বিচারে ভুল থেকে যাবে। স্তালিনের ব্যক্তিগত মানসিকতা কি রাশিয়ার গতি-প্রকৃতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করে নি? কিংবা মাওয়ের মানসিকতা চীনকে?

সমাজমানস বিভিন্ন ব্যক্তিমানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এবং এজন্যই সমাজ-বিজ্ঞানকে গাণিতিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন প্রকল্প ও বিকল্পের মধ্য দিয়ে সমাজগতি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা করা যায়, নিখুঁত সিদ্ধান্তে সব সময় আসা যায় না। ব্যক্তিমানস অত্যন্ত জটিল বিষয়, যান্ত্রিক কলাকৌশলের মত এটি সবসময় বাঁধাধরা পথে চলে না। মাত্র একশ বছরের মধ্যেই ফ্রয়েডীয় সূত্রে অনেক ভুল ধরা পড়েছে, পোস্ট-ফ্রয়েডীয়ানরাও এগিয়ে গেছেন অনেকটা। এরিকসনের তত্ত্ব "Identity crisis" নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। বিপরীত দিকে পাভলভের উত্তরসূরীরা তাঁদের বিহেভিয়া-রিষ্টিক সাইকোলজীতে পরিবেশকেই (environment) শেষকথায় পরিণত না করে মানুষের মনে স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বে স্বীকার করছেন।

সমাজবিজ্ঞানীর দায়িত্বও সেজন্যে বেড়েছে। অণুকে (molecule) বিচার না করে যেমন কোনও বস্তুর চরিত্র নির্ধারণ করা যায় না, মানুষের ক্ষেত্রেও কি তেমনি ব্যক্তি-মানসকে বিচার করে সমাজমানসকে বুঝতে হয়?—এই প্রশ্ন ক্রমশই জোরাল হয়ে উঠেছে। মানুষের ব্যক্তিগত মানসিকতা, অন্য মানুষের এবং দলের প্রতি তার মানসিকতার, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং শেষপর্যন্ত দলে-দলে সম্পর্কের মানসিকতা, অর্থাৎ এককথায় বিষয়ীগত সম্পর্ক থেকে বিষয়গত সম্পর্কের টানাপোড়েন না বুঝলে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ্য শক্তিগুলির সন্ধান পেলেও সুপ্ত শক্তি সম্ভাবনাকে ধরা যাবে না। আপাতত গুরুত্বহীন অথচ প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় উপাদানগুলির গতিশীলতা বোঝার জন্য দরকার দূরদৃষ্টি।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়—রাষ্ট্রপরিচালকদের ব্যক্তি মানসিকতা বিশ্লেষণ করলেই কি সমাজের গতি-প্রকৃতি বোঝা যাবে? অথবা যদু কৈবর্ত-রহিম শেখদের মানসিকতাও জানা দরকার? দরকার দুটোই। নমুনা সমীক্ষার (sample survey) সাহায্যে সমাজের একটি দিক যেমন উন্মোচিত হয়, নেতাদের বিশ্লেষণেও তেমনি অন্যদিক প্রকাশিত হয়। এই দুই দিকের কোনটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করবে এবং এই প্রভাব বিস্তার করতে কতটা সময় নেবে, সেটি আন্দাজ করার ওপরই প্রকাশ পায় সমাজবিজ্ঞানীর নিপুণতা।

মার্কস বলেছিলেন, আমেরিকা-বৃটেন-জার্মানী-হল্যাণ্ডের মতো শিল্পোন্নত দেশেই প্রথম শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে বলেছিলেন, "আমি বলছি শোন—শূদ্র অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং তারপর চীনে।" এতেই বোঝা যায় যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীকে অনেক গভীরে গিয়ে সমাজমানসকে বুঝতে হয়, বুঝতে হয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

ছয় ঃ বিকল্প সমাজের চিন্তা

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংবাদপত্র, সমাজগবেষক ও বামপন্থী রাজনীতি-তাত্ত্বিকেরাই বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণে সমস্যার রূপ ও সমাধানের চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এদের বিশ্লেষণগুলি কতখানি সার্বিক? অর্থাৎ, সমস্যাকে বোঝার জন্য তারা যেসব ছক বা মডেল্ (model) ব্যবহার করছেন, সেই মডেল্ কি সমাজের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে সমস্যার স্বরূপ বোঝাচ্ছে অথবা একদেশী দৃষ্টির সাহায্যে সামাজিক চিত্রের একটি দিক তুলে ধরছে?

যেমন আসামের সমস্যা। অনেকে এর মূলে অর্থনৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এটা একটা দিক। কিন্তু বাঙালী ও মারাঠীদের মতো অসমীয়ারাও যে চাকরীপ্রিয় জাতি, শিল্প বা ব্যবসা স্বাধীনভাব গড়ে তুলতে তারা বিশেষ এগিয়ে আসেনি, এবং এজন্যই যে চাকরীর ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে বাঙালীদের ওপর আক্রমণ আসছে এ-কথা কি সমাজ-বিশ্লেষণে একটা বড় উপাদান (factor) নয়? কাশ্মীরের সমস্যা বা নাগা সমস্যার পেছনে সংস্কৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ ভারত-সংস্কৃতিতে একটি গোষ্ঠী কিভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াবে, মূল প্রশ্ন এটাই। অর্থাৎ (identity)র সমস্যা।

এভাবে আমরা দেখছি যে যেহেতু এই দেশে বহুগাঠনিকতা (multistructurality) বিদ্যমান সেহেতু সমাজ-বিশ্লেষণ ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে। মার্কসবাদী গবেষকদের বিশ্লেষণও একদেশী হয়ে পড়ছে এর ফলে। তারা উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। কিন্তু সমস্যা হল এ-দেশের কৃষি ও শিল্পে ভিন্ন ব্যবস্থা বিদ্যমান। আমেরিকায় কৃষি ও শিল্পে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে, কিন্তু, ভারতীয় শিল্পে ধনতন্ত্রী ঝোঁক স্পষ্ট হলেও কৃষিতে তা নয়। ফলে মার্কিন সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে এক কথায় প্রকাশ করা গেলেও ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঠিক সেরকম এককথায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না। অথচ মার্কসীয় মতে এই ব্যবস্থার ধারণাটি সমগ্র সমাজ-বিষয়ক ধারণা। আবার নাগাল্যাণ্ড মিজোরামের কৃষি ব্যবস্থা আর পাঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষি ব্যবস্থা একরকম নয়। ফলে মার্কসবাদীদের মধ্যে মত-বিরোধের অন্ত নেই—আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ত আধা ধনতান্ত্রিক, উপনিবেশিক, প্রাক্-পুঁজিবাদী

ইত্যাদি নানান তত্ত্বের মোড়কে সমাধান দিতে হচ্ছে। তারা ভুলেই যান যে পঃ বঙ্গের বা তামিলনাড়ুর সমাজ-বিশ্লেষণে মধ্যবিত্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। মার্কসীয় দর্শনে অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে এরা শ্রেণী নয়, কিন্তু আচরণগত ঐক্যে এরা এমন এক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে যাদের বাদ দিয়ে সমাজচিত্রের পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা যায়না।

সমাজের পূর্ণ চিত্র পাবার জন্য প্রত্যক্ষবাদী (insiders) সমাজবিজ্ঞানীরা একটি বা দুটি গ্রাম বা শহর বেছে নিয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠি সমাজে প্রত্যক্ষ নমুনা সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশের মেহেরপুর গ্রাম বেছে নিয়ে ডঃ আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরী এভাবে গবেষণা করেছেন।[১] এধরণের গবেষণা সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান নির্মাণে সাহায্য করলেও sampling theory বা নমুনাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা আরও সঠিক চিত্র পাই, অর্থাৎ একটি স্থানের নমুনার চেয়ে একশটি স্থানের নমুনার গড় অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য। বাঁকুড়া বা বর্ধমানের একটি গ্রাম যেমন পঃ বঙ্গের সামগ্রিক কৃষির রূপটি তুলে ধরতে পারে না, তেমান বাঙ্গালী, বিহারী ও তামিলনাড়ুর মধ্যবিত্তদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। আবার পঃ বঙ্গ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশের সরকারগুলির নীতি ও কর্মধারার বিচার শাসক দলগুলির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেখে করা যায় না।

ভারতীয় সমাজ তথা বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য সমাজের বহুসাংগঠনিকতার দরুণ সমাজ-বিশ্লেষণে-যে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে তার সমাধানে সমাজগবেষকেরা বর্তমানে নানান মডেলের উদ্ভাবন করছেন। এই প্রবন্ধে আমরা একটি বিকল্প মডেল্ উপস্থাপিত করছি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায়।

বিকল্প মডেল

গত শতাব্দীতে স্বামীজী কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন আগামী ইতিহাস প্রসঙ্গে যেগুলি পরবর্তীকালে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়। যেমন প্রথমে রাশিয়ায় ও পরে চীনে শূদ্র-অভ্যুত্থান ঘটবে, ইউরোপে প্রলয়ংকরী যুদ্ধে সভ্যতার ওলট-পালট ঘটবে, স্বাধীন ভারতের বিপদ আসবে চীনের দিক থেকে, ভারত এক অদ্ভুত উপায়ে স্বাধীন হবে, বিশ্বে হুন ও নিগ্রো শক্তির উদ্ভব ঘটবে, সমগ্র বিশ্বে ভারত এক নতুন নীতির পথ দেখাবে, ইত্যাদি। যে স্বামীজী হাতদেখা-জ্যোতিষচর্চাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, তিনি এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি কিভাবে করেছিলেন? তবে কি সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি

নতুন কোন সূত্রের হদিশ পেয়েছিলেন ?

মূলতঃ "বর্তমান ভারত", "পরিব্রাজক", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বই তিনটি ও সেইসাথে বিভিন্ন বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে তিনি যেভাবে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন, আমরা সেগুলিকেই ভিত্তি করে আলোচ্য বিকল্প মডেল্ তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বইতে তিনি দেখিয়েছেন একটি সমাজ কিভাবে আছে এবং কেন এভাবে আছে। "বর্তমান ভারত", "ভারতে বিবেকানন্দ" ইত্যাদি বইয়ে পাওয়া যায় তাঁর অপূর্ব ইতিহাস-চেতনার কথা, অর্থাৎ অতীত বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে কতগুলি সমাজ বর্তমান অবস্থায় এসেছে। উল্লিখিত ভবিষ্যৎ বাণীগুলির মাধ্যমে বোঝা যায়, বর্তমান সমাজ ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবে এ-প্রসঙ্গও তাঁর চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। আর বিভিন্ন বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে তিনি আলোচনা করেছেন রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক অনেকগুলি প্রশ্ন। অর্থাৎ সমাজস্থিতি কি হওয়া উচিত এ-প্রশ্নও তিনি এড়িয়ে যাননি। সামাজিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে আধুনিক কালে ডঃ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন,[২] স্বামীজীর চিন্তধারায় সেই প্রশ্নগুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সমাজ-বিশ্লেষণে স্বামীজী যে মডেল্ তুলে ধরেছেন তার মধ্যে প্রথমেই আসছে বর্তমান অবস্থার কথা, অর্থাৎ "সমাজটা বর্তমানে কি" এই প্রসঙ্গ। এর সাথেই প্রশ্ন তুলেছেন ইতিহাসের সম্পর্কে, অর্থাৎ "কিভাবে এই অবস্থা তৈরী হয়েছে ?" বর্তমান ও অতীতকে বিশ্লেষণ করে এই দুই পর্বকে সম্মিলিত করেছেন তৃতীয় প্রশ্নে—"এই সমাজটি কেন এভাবে আছে ?" সামাজিক গতি নির্ধারণ করতে গিয়ে পরবর্তী যে প্রসঙ্গটি এসেছে সেটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত, অর্থাৎ "এটি ভবিষ্যতে কি ধরণের হবে ?" সর্বশেষে সমাজনীতির আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তিনি আলোচনা করেছেন "এটি ভবিষ্যতে কি ধরণের হওয়া উচিত"। এভাবে সমাজ-বিশ্লেষণে একটি সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি আলোচনায় সময় তিনি সেই সমাজের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিও তুলে ধরলেন।

সেইসাথে আরেকটি বিষয়ও তুলে ধরলেন—বিশ্লেষণের মডেলটি কর্মসূচী-ভিত্তিক হওয়া দরকার। ব্যবহারিক বেদান্তের (Practical Vedanta) কথা বারবার তিনি বলেছেন এই উদ্দেশ্যেই। বিশ্লেষণে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ত্রুটি

প্রশ্ন—"কি হবে" এবং "কি হওয়া উচিত"—আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখালেন যে শেষ প্রশ্নটি না তুললে নিয়তিবাদী হতে হয়। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানী যদি নতুন ভবিষ্যতের সন্ধান না দিতে পারেন, (activist) না হন, তবে তিনি ঐতিহাসিকের স্তরেই পড়ে থাকবেন। ফলে শেষ প্রশ্নে ("কি হওয়া উচিত") স্বামীজী বর্তমান অবস্থা থেকে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগোবার নীতি-নির্ধারক প্রশ্নটিই শুধু তুললেন না, সেইসাথে সমগ্র মডেলটিকেই কর্মসূচিভিত্তিক করে তুলে বিপ্লবের আহ্বান জানালেন।

কয়েকটি মৌল প্রশ্ন

ভারতে সমাজবিজ্ঞান যখন প্রাথমিক স্তরেই পড়েছিল, সেই গত শতাব্দীতে স্বামীজী এ প্রসঙ্গে সমাজ-বিশ্লেষণের মডেল গড়ে তুলতে গিয়ে কতগুলি মৌল প্রশ্নের অবতারণা করলেন।

ভারত প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যগুলিই ধরা যাক। আগেই আমরা আলোচনা করেছি, স্বামীজী ব্রাহ্মণ-শাসন, ক্ষত্রিয়-শাসন ও বৈশ্য শাসন, শূদ্র-শাসনের কথা বলেছেন, আবার "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" "ভারতে বিবেকানন্দ" বইয়ে "ধর্মই ভারতের প্রাণ" কথাটি বারংবার বলেছেন। এর তাৎপর্য কি ? চার রকম শাসন ও তার সংস্কৃতির প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্রীয় দর্শনের (state ideology) কথা বলছেন, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমাজমানসের (mass culture) কথা তুলেছেন। অর্থাৎ তিনি মার্কসের মতো শুধু রাষ্ট্রীয় দর্শনের কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি দেখালেন সমাজ-মানস বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করলে সমাজ বিশ্লেষণে ত্রুটি থেকে যায়।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে তিনি শঙ্কর-রামানুজের কথা শুনে সমাজে ব্যক্তির প্রভাব দেখিয়েছেন দর্শনের (philosophy) উল্লেখ করে। এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য কি ? সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের প্রয়াসে গড়ে ওঠে দর্শন। সংস্কারমুক্ত যুক্তিনির্ভর বিশ্বীকরণের মাধ্যমে গড়ে-ওঠা, একটি দর্শন গ্রহণ করে সমাজ-পরিচালক, এবং তখনই তা পরিণত হয় রাষ্ট্র আদর্শে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। "শাসন" ব্যাপারটি যতক্ষণ আছে, ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রবৃত্তিও ততক্ষণ আছে। এই "ক্ষমতায় টিকে থাকা" দর্শন একটা নতুন মাত্রা (dimension) দেয় এবং রাষ্ট্র-দর্শনে পরিণত করে। আর সমাজমানস কি ব্যাপার ? দীর্ঘদিনের অভ্যাসে

ও ঐতিহ্যে সাধারণ মানুষ এক বিশেষ ধরণের বিশ্ববীক্ষণ (worldview) গড়ে তোলে। এই ধারা তাদের চেতন মনের চেয়ে অবচেতন স্তরেই বেশি ক্রিয়াশীল (collective subconscious)। এই সামগ্রিক অবচেতন ধারা যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে সেটাই হল সমাজ মানস, স্বামীজী একে বলেছেন "জাতীয় বৈশিষ্ট্য"। সমাজ-বিশ্লেষণে তিনি দেখালেন রাষ্ট্রদর্শনের সাথে সমাজ-মানসকেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান না দিলে বিশ্লেষণে বিরাট ত্রুটি থেকে যাবে। সেই সাথেই এই দুটির টানা-পোড়েনের প্রসঙ্গটিও তিনি তুললেন ভারত-ইতালি-অস্ট্রিয়া-জার্মানী-ফরাসী দেশের অতীত ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ("বর্তমান ভারত" ও "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বই দুটিতে) রাষ্ট্র-দর্শনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলির পার্থক্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে তার সদর্থক ও নেতিবাচক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সমাজমানসের ওপর তার ক্রিয়া এবং সেইসাথে রাষ্ট্রদর্শনের ব্যবহারিক রূপের ওপর সমাজমানসের প্রভাব কিভাবে দেখা দেয় এ-প্রসঙ্গটি স্বামীজীর সমাজ-বিশ্লেষণ ধারার এক মৌল প্রত্যয়।

দ্বিতীয়ত, একটি গোষ্ঠী সেই সমাজের প্রতি কি-ধরণের মানসিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছে (how a group reacts to the whole)। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে—গোষ্ঠী-নির্ধারণ হবে কিসের ভিত্তিতে ? স্বামীজী এই প্রশ্নে সামাজিক মৌল শক্তির ভিত্তিতে সামাজিক স্তর-বিন্যাস বা গোষ্ঠী-নির্ধারণ করেছেন। এটি তাঁর মৌলিক অবদান। জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ, কায়িক শ্রম—এই চারটি মৌল শক্তির ভিত্তিতে তিনি প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় নেতা, বুদ্ধিজীবী), ক্ষত্রিয় (সামরিক বাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি) বৈশ্য, (ব্যবসায়ী) ও শূদ্র (কায়িক শ্রমভিত্তিক কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি) এই চারটি স্তরের কথা বলেছেন। তাঁর এই স্তর নির্ণয় বর্ণপ্রথা নয়, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নামকরণ, যদিও এই স্তর বিন্যাসের মধ্যে উপবিভাগও রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলি পৃথকভাবে সমাজের প্রতি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছে, ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে উঠছে কোন্ গোষ্ঠী, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম, এ-সব আলোচনা করে গণচেতনার স্তর নির্ধারণের ওপর জোর দিয়েছেন স্বামীজী। এবং এটি করতে গিয়ে সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতার উৎস, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়েছে।

তৃতীয়ত, সমাজ-বিশ্লেষণে যে প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত

হবার দাবি রাখে সেটি হল—একটি সমাজের 'টি'কে থাকা (function). এবং পরিবর্তিত হওয়া (change) কি একই মডেল্ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? সমাজের স্থিতি (statics) ও গতি (dynamics) ব্যাখ্যায় একই বিশ্লেষণ ধারা কি যুক্তিসঙ্গত? লেভী ব্রাউন জোর দিয়েছেন সমাজ বহমান থাকার (function) ওপর, যেখানে মার্কস জোর দিয়েছেন পরিবর্তনের (change) ওপর। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী দুটি মডেল্ উপস্থাপিত করেছেন—সামাজিক কাঠামোর (social structure) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখালেন কোন্ কোন্ শক্তি কিভাবে একে ধরে রাখে সেটি বোঝার জন্য যেমন বিশদ আলোচনা বা মডেল্ দরকার, কেন ও কিভাবে সেই কাঠামো ভেঙে যায় তার ব্যাখ্যারও মডেল্ প্রয়োজন। তিনি দেখালেন, সমাজে সংকট (crisis) আসুক বা না-ই আসুক, সমাজের মধ্যে এমন কিছু শক্তি আছে যা সমাজকে ধরে রাখে। এই শক্তি সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে কিভাবে কাজ করছে—অর্থাৎ একটি সমাজে সেটি টিকে থাকার মাধ্যম (functional stabiliser) হিসেবে কতখানি কাজ করতে পারছে বা আদৌ পারছে না—তার ওপরই নির্ভর করছে সমাজ স্থিতিকে, না গতিকে আশ্রয় করবে। অর্থাৎ স্বামীজী যদিও সমাজের স্থিতি ও গতির জন্য পৃথক মডেল্ উপস্থাপিত করলেন, তবুও তিনি এই মডেলগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক (different but connected models) তুলে ধরেছেন। মডেলগুলি নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল।

কাঠামোগত স্থিতি (function)	পরিবর্তন (change)
(১) সামাজিক চারটি মৌল শক্তির মধ্যে কোন্‌টি মূল পরিচালক শক্তি হিসেবে কাজ করছে?	(১) পরিচালিকা শক্তি কোন গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে বিশেষ সুবিধার (special privilege) জন্ম দিচ্ছে কি না।
(২) সমাজমানসের চিত্র কি? (জাতীয় বৈশিষ্ট্য)	(২) সামাজিক পরিস্থিতি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশে কতটা বাধা দিচ্ছে? গণচেতনা কোন্ স্তরে?
(৩) সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গণচেতনার স্তর কি রকম?	(৩) বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব নতুন সংকট তৈরী করছে কি না?

(৪) বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের ব্যাপারে সমাজের প্রবণতা কোন দিকে ?

(৪) জাতীয় বৈশিষ্ট্য কোন্ রূপ নিয়েছে ?

(৫) অন্য জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি মনোভাব কি রকম ?

স্বামীজীর এই তাত্ত্বিক আলোচনাগুলি আরও পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা যাক। এটি করা সহজ হবে যদি আমরা একটি বিশেষ সমাজ বেছে নিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করি। যেহেতু বর্তমান লেখক ও পাঠকেরা বাঙালী সেহেতু সাম্প্রতিক পঃ বঙ্গের বাঙালী সমাজকেই এখানে বেছে নেওয়া যাক। সংক্ষেপে এই সমাজের একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করছি স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সমাজ-বিশ্লেষণের পথ ধরে।

পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রশক্তি

একটি সমাজের শাসক গোষ্ঠী সমাজের মৌল চারটি শক্তির কোন্‌টির ওপর বেশি জোর দিচ্ছে শাসনের ব্যাপারে, তার ওপর ভিত্তি করে স্বামীজী শাসক-শ্রেণীর চরিত্র নির্ধারণ করেছেন।

বর্তমানের বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত আদর্শ শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধিত্ব। সুতরাং তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটি শূদ্র শাসন।

এবারে সরকারের বাস্তব কর্মপন্থা বিচার করা যাক। এটি কি যথার্থ অর্থে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ বেশি রক্ষা করছে ? পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং অপারেশন বর্গা অতিদরিদ্র বর্গাদারদের স্বার্থ বাঁচাবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতের যে ত্রুটিগুলি পঃ বঙ্গ সরকারেরই অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন তা হল পঞ্চায়েতগুলি গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করছে না, গ্রামবাসীদের স্ব-শাসনে সক্রিয় অংশ নিতে দিচ্ছে না, বিভিন্ন পদাধিকারী না করে পঞ্চায়েত কাজকর্ম মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে, অভিজ্ঞ হিসাব পরীক্ষক দিয়ে পঞ্চায়েত হিসেবপত্র রাখছে না। মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে পঞ্চায়েতগুলি প্রকৃত পক্ষে এক ধরণের আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছে। ভূমি-সংস্কার ও অপারেশন বর্গায় গরীব চাষীর উপকার হয়েছে কিন্তু সেই সাথেই বড় জোতের জমি বাড়ছে। অর্থাৎ চাষীদের প্রাপ্ত জমি Un-economic Holding হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কৃষি

উৎপাদনের হার সেই অনুপাতে বাড়ছে না এই কারণেই। সরকারী হিসেবে ১৯৮২ সালের শেষে ১৩ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবারকে সাড়ে বারো লক্ষ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এর চেয়ে সরকার যদি সমবায় প্রথায় চাষ করার জন্য ভূমিহীন কৃষকদের উৎসাহিত করতেন তবে কৃষক স্বার্থে তা একটি বড় পদক্ষেপ হত। তা না হওয়ায় পরবর্তী প্রজন্মে ১৩ লক্ষ পরিবার ৩৯ লক্ষ পরিবারে পরিণত হলে (প্রতি পরিবারে গড়ে ৩ জন শিশু আছে ধরে নিয়ে) সমস্যা নতুন করে দেখা দেবে। শ্রমিক ফ্রন্টে অর্থনীতিবাদ কাজ করায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে সংগঠিত শ্রমিকদের মাইনে বাড়ালেও জাতীয় স্বার্থ মার খাচ্ছে। এসব তথ্য থেকে বলা যায় পঃ বঙ্গের সরকার সুপ্রশাসনের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে।

এই সাথেই ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক সুস্পষ্ট। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের স্ব-শাসনের বদলে দলীয় শক্তি বৃদ্ধির প্রবণতা, স্বেচ্ছাসেবী ও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর বিধি-নিষেধ চাপানো ও সরকারী লোক ঢোকানোর চেষ্টা, সংবাদপত্রকে দমন করার চেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অনাস্থা সূচিত করে। এবং এই ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক দলীয় সদস্য ও নেতাদের বিশেষ সুবিধার (special privilege) অধিকারী করে তুলছে। এই বিশেষ সুবিধা ভোগ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক সরকারকে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

বাঙালীর সমাজমানস

জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও কায়িক শ্রম—এই চারটি মৌলশক্তির মধ্যে কোনটি বেশি প্রভাব ফেলেছে একটি সমাজের ওপর, সেটি নির্ধারণ করে স্বামীজী সমাজ-মানসিকতাকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। পরে আলোচনা করেছেন সেই সমাজ-মানসিকতার বৈশিষ্ট্য।

পঃ বঙ্গের বাঙালীর ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রয়োগ করে দেখা যাক। বাঙালীরা সাধারণভাবে সমরকুশল নয়, কায়িক শ্রমেও তাদের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। অতএব শৌর্য ও কায়িক শ্রমের প্রভাব কম। অর্থের ব্যাপারে বিষয়টি একটু জটিল। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালীরা সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে আছে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থকেন্দ্রিক এবং এদের অর্থগৃধ্নুতা প্রকট। অতএব অর্থের প্রভাব শৌর্য ও শ্রমের চেয়ে বেশি। অর্থ ও জ্ঞানের মধ্যে

বাঙালী সমাজমানসে কোন্‌টির প্রভাব বেশি? শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বাঙালী মানসের যে বড় বৈশিষ্ট্য তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এক বাঙালী ভদ্রলোক তার মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে দুজন পাত্রের সন্ধান পান— একজন ধনী কিন্তু পড়াশোনা কম, আরেকজন মধ্যবিত্ত অধ্যাপক। দেখা যাবে ভদ্রলোক পাত্র হিসেবে অধ্যাপককেই পছন্দ করবেন ধনী না হওয়া সত্বেও। অর্থাৎ অর্থগৃধ্নুতা সত্বেও বাঙালী সমাজে মর্যাদার উৎস জ্ঞান।

বাঙালীর গ্রামীন সমাজেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অন্ন-বস্ত্রের অভাব মেটাতে কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হলেও লেখা-পড়ার আগ্রহ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তারা সাধারণভাবে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত হওয়া সত্বেও নির্বাচনে সচেতনতার পরিচয় দেন। এ ছাড়া দেখা যায় যে গ্রামে জোতদার বা মন্ত্রীর চেয়ে মন্দিরের পুরোহিত ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের মর্যাদা বেশি। বাংলায় বাউল, কীর্তন ও শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও জীবন-জিজ্ঞাসার উপাদান সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

এভাবে বোঝা যায় বাঙালীর সমাজমানসে জ্ঞানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ভারতের বিভিন্ন শহরে যত বইমেলা হয় তার মধ্যে কলকাতাতেই দর্শক সংখ্যা ও বই বিক্রী সবচেয়ে বেশি।

সামাজিক স্তরবিন্যাস

মৌলশক্তিগুলিকে ভিত্তি করেই স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্ধারণ করেছেন। সেই সাথে কোন্ কোন্ গোষ্ঠী প্রভাবশালী হয়ে উঠছে সেদিকে নজর রাখার কথা বলে বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজের প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছে তার আলোচনা করেছেন। পঃ বঙ্গের ক্ষেত্রে এই সূত্রাবলী প্রয়োগ করা যাক।

জ্ঞানকে আশ্রয় করে যে গোষ্ঠীগুলি প্রভাবশালী হয়ে উঠছে তার মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ মিশন ও খৃষ্টান চার্চ সামগ্রিকভাবে, এবং আঞ্চলিকভাবে বালক ব্রহ্মচারী, অরবিন্দ সোসাইটি, মুসলীম ধর্মসংস্থাগুলি বাঙালীদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে। আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শিক্ষক ও সাংবাদিকেরাই শক্তিশালী। এদের আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি—স্বাধীন, বিদেশী শক্তি বা সরকারের অনুগ্রহভাজন, এবং মধ্যবর্তী। আনন্দবাজার পত্রিকা ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রায়শঃ

সরকারী ও সরকার-সমর্থকদের হামলায় রুখে পড়ছে কেন? কারণ এই দুটি সংস্থা রাজনীতি না করলেও এমন আদর্শের (ideology) ধারক যা সরকারের সর্বগ্রাসী ক্ষমতায় ঝোঁককে ব্যাহত করছে, এবং শুধু তা-ই নয় সংস্থা দুটি সামাজিক শক্তিতেও পরিণত হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক সংগঠনগুলি সরকারী সব নির্দেশ মেনে নিতে রাজী হচ্ছে না; ফলে সরকারের ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের প্রয়াস ব্যাহত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি বৈশিষ্ট্য, বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশই সরকারী ছত্রছায়াকে পছন্দ করেন।

অন্যতম সামাজিক মৌলশক্তি শৌর্যকে আশ্রয় করে যে দুটি গোষ্ঠী প্রভাবশালী হয়েছে তারা হল পুলিশ ও মাস্তান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পুলিশকে রাষ্ট্রশক্তির অন্যতম হাতিয়ার ধরা হয়। কিন্তু এই কেতাবী জ্ঞান দিয়ে পঃ বঙ্গের সমাজ-বিশ্লেষণ করলে চলবে না। বহু ক্ষেত্রে পুলিশ আদালতের নির্দেশ মানেনি। সরকারের অর্থমন্ত্রী এক ঘুষখো'র কনস্টেবলকে হাতে-নাতে ধরেও কিছু করতে পারেননি। অর্থাৎ পুলিশ ক্রমশই নিজস্ব স্বাধীন গোষ্ঠীসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মস্তান আর বিহারের মাফিয়া ঠিক এক বিষয় নয়! বিহারের মাফিয়া বা গুণ্ডাদের উৎস প্রাক্তন জমিদারদের লেঠেল ও ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজনৈতিক দলগুলি এই গুণ্ডাদের ব্যবহার করত, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বে এই গুণ্ডাদের আসতে দেয়নি। নকশাল আন্দোলনের সময় পুলিশ শহরের ও শিল্পাঞ্চলের বস্তি-গুলিতে ১০৫ টাকা মাইনের অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করল বস্তিবাসী তরুণ ও যুবকদের মধ্যে থেকে। উদ্দেশ্য ছিল নকশালদের মধ্যে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে আন্দোলন ব্যর্থ করা! সত্তরের দশক থেকে এই শহরের দরিদ্র যুবকদের অনেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকল ও নেতা হল। নির্বাচনের সময় এদের ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করল কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং এভাবেই urban poor leadership মাস্তানতন্ত্র কায়েম করল। পাশাপাশি গ্রামেও বেশ কিছু উঠতি নেতা দেখা গেল যারা আচারে ব্যবহারে এই মাস্তানতন্ত্রের শরিক।

অর্থের সাহায্যে যে দুটি গোষ্ঠী বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে সে-দুটি হল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং বিদেশী রাষ্ট্রের এজেন্ট। নির্বাচনে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় তার একটি বড় অংশ রাজনৈতিক দলগুলি পায় ধনী ব্যবসায়ীদের

কাছ থেকে। সুতরাং বিনিময়েও অনেক কিছু আদায় করে নেন ব্যবসায়ীরা। সরকার (তা সে যে পন্থীই হোক না কেন) ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিকট সম্পর্ক সেজন্য সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। কলকাতায় লোডশেডিং, বাস-ট্রাম বিভ্রাট, আবর্জনার পাহাড়, এবং মিছিল-নগরী হওয়া সত্ত্বেও এই শহরে অবাঙালীদের ভীড় বেড়ে গিয়ে বর্তমানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াটা সেজন্য আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি, বিশেষত আমেরিকা-রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি আরবী রাষ্ট্র এদেশে টাকা ছড়িয়ে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের দলে টানছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ছবি তৈরী করছে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। এই দুই গোষ্ঠী—ব্যবসায়ী ও বিদেশী এজেন্টরা—অন্যান্য গোষ্ঠীর মতো অতটা প্রকাশ্যে কাজ করে না, পর্দার অন্তরালে থেকেই এরা কাজ করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

কায়িক শ্রমকে ভিত্তি করে কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ যে গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে তারা সমাজে কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব না রাখলেও দুটি কারণে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, নির্বাচনে ভোটদাতা হিসেবে এই গোষ্ঠী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য। দ্বিতীয়ত, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ভবিষ্যতে এই গোষ্ঠীকে আরও সম্ভাবনাময় করে তুলবে। পঃবঙ্গে কর্মে নিযুক্ত মানুষের শতকরা ২৫ জন ক্ষেতমজুর এবং ১৪ জন বর্গাদার। সংখ্যার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। সেই সাথে লক্ষণীয় গ্রামে কৃষি-সম্পর্ক বিচ্যুত মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে—১৯৫৪ সালে এই হার শতকরা চব্বিশ থেকে বেড়ে ১৯৭২-এ শতকরা একত্রিশে দাঁড়িয়েছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, গ্রামে ভূমিহীনদের সংখ্যা কমলেও Un-economic holding এর জন্য ক্ষুদ্র জমির চাষীরা ধনী ও মাঝারী চাষীদের ভাগে তাদের জমি দিয়েছে এবং নিজেরা অধিকাংশই ক্ষেতমজুর বা শহরে অন্য কাজে নিয়োজিত হয়েছে। কৃষিব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যাচ্ছে তা হল পঃবঙ্গের কৃষিতে উৎপাদন ঘটেছে ক্ষেতমজুর-বর্গাদারদের শ্রমের বেচাকেনা বাদ দিয়েই, অর্থাৎ শ্রম এখানে অবাধ পণ্যের রূপ নেয়নি। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মাত্র ২৫-৩০% বাজারে আসে বিক্রীর জন্য, বাকী অংশ উৎপাদকদের ভোগেই লেগে যায়। তৃতীয়ত, কৃষিতে ক্রমশই পুঁজি নিয়োগ বাড়ছে। এবং চতুর্থত, উৎপাদনশৈলী ও মানের ক্রমোন্নতি ঘটছে।

সংগঠিত শিল্পে বাঙালী শ্রমিকদের সংখ্যা খুবই কম। রেল, ইঞ্জিনীয়ারিং,

ডক ও বন্দর, রসায়ন, চট, চা শিল্পে অবাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কলকাতা কর্পোরেশন, ইলেকট্রিক সাপ্লাইতেও একই অবস্থা। বাঙালী শ্রমিক মফঃস্বল অঞ্চলে অসংগঠিত ক্ষুদ্রশিল্প, বিড়িওলা, হকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং গ্রামাঞ্চলে কামার-কুমোর-মালাকার ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত। অর্থাৎ আধুনিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বাঙালী শ্রমিকেরা উপকৃত হচ্ছে না।

শ্রমিক ও কৃষক ছাড়া এই বিভাগে (অর্থাৎ কায়িক শ্রমে) আরও বহু স্তরের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন গৃহস্থ বাড়িতে ঝি-চাকর ইত্যাদি, কিন্তু প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে এরা দানা বাঁধতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় কেরাণীরাও শূদ্র। যদিও কায়িক শ্রমই প্রধানত তাদের পেশা নয়, তবুও কাজের বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বামীজী এদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। বাঙালী শূদ্রসমাজে এই কেরাণী-গোষ্ঠী রীতিমতো প্রভাবশালী। এরা আর্থিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীদের কাছাকাছি, এবং পশ্চিমবঙ্গে এই গোষ্ঠী মূলতঃ বাঙালীদের নিয়েই তৈরী। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এরা অনেকটা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সমগোত্রের।

এ-ছাড়া আরেকটি আপাত দুর্বল কিন্তু সম্ভাবনাময় গোষ্ঠী হল ছাত্র-সমাজ। ভাল ছাত্রেরা Careerist এবং রাজনীতিতে অনাগ্রহী। ছাত্রদের সংখ্যালঘু অংশ ইউনিয়নের কাজকর্মে যোগ দেয় মোটামুটি তিনটি কারণে। প্রথমত, তরুণ বয়সে অ্যাডভেঞ্চারিজমের স্পৃহায় অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কৃপাধন্য হবার আশায়। তৃতীয়ত, ইউনিয়নের সোশ্যাল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের টাকা-পয়সার আকর্ষণে। কিছু ছাত্র অবশ্য আদর্শের প্রেরণাতেই ইউনিয়ন করে। ছাত্র-দলগুলি কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির চেয়ে রাজনৈতিক কারণেই ছাত্র-আন্দোলন বেশি হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে সাথেই গণচেতনার স্তর সম্পর্কিত প্রশ্নটি ওঠে। অর্থাৎ, সমাজের প্রতি গোষ্ঠীগুলির দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপ কি রকম? শৌর্য ও অর্থকে ভিত্তি করে যে গোষ্ঠীগুলি রয়েছে সেগুলির দৃষ্টিভঙ্গি—কতটা পুটেপুটে পাওয়া যায়। মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজ-চেতনা এদের মধ্যে বেশি নেই বলে এরা মোটামুটিভাবে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্যশাসনে ব্যবসায়ীরা যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে

সামাজিক উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িয়ে, পশ্চিমবঙ্গের শূদ্রশাসনে সেটি হয়ে যাচ্ছে না। জ্ঞান ও কায়িক শ্রমকে ভিত্তি করে যে সব গোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে তিনরকম চরিত্রের সন্ধান মেলে—স্বাধীন, দুর্বল ও লুটেপুটে খাওয়ার দল। স্বাধীন অংশটি সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে মূল্যবোধ ও সমাজ চেতনার বিস্তার ঘটিয়ে! দুর্বল অংশটি সৎ ও উদার, কিন্তু নানা কারণে সক্রিয় ভূমিকায় এগিয়ে আসছে না। সামগ্রিকভাবে গণচেতনার স্তর দুর্বল।

বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতি

ইতিহাসে দেখা যায় যে মানুষ বহিঃপ্রকৃতি (external nature) ও অন্তরপ্রকৃতিকে (internal nature, mind) জয় করতে করতে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। প্রথমটি সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির, এবং দ্বিতীয়টি নীতিবাদ ও ধর্মের। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব বলেই সমাজে সংকট দেখা দেয়। মধ্যযুগীয় ভারতে ধর্মের ওপর জোর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানকে অবহেলা করা হয়েছে এবং আধুনিক পাশ্চাত্যে হয়েছে ঠিক এর বিপরীত। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালী সমাজে এই সামঞ্জস্য কতটা দেখা যাচ্ছে ?

বিজ্ঞানের প্রভাব গ্রামীণ জীবনে বিশেষ পড়ে নি যদিও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শহরগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। টি ভি, টেপ রেকর্ডার, ফ্রীজ ইত্যাদি মধ্যবিত্তদের দৈনন্দিন জীবনেও প্রবেশ করেছে। কিন্তু এইগুলির ব্যবহার বিলাসিতার জন্য যতটা বেড়েছে, বিজ্ঞানের ইতিবাচক ভূমিকার জন্য ততটা নয়। এর মূলে অর্থগৃধ্নুতা একটি বড় কারণ। ফলে ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান-পত্রিকার প্রকাশ ইত্যাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাপক জনসমাজের আচরণে যুক্তিবাদের প্রভাব ততটা বাড়ে নি।

বিজ্ঞানের এই নেতিবাচক ভূমিকায় সমাজের একাংশের প্রতিক্রিয়া বিশেষ লক্ষণীয়। ধর্মীয় বই বিক্রী অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে, এবং ধর্মের আকর্ষণ নতুন করে অনুভূত হচ্ছে।

অর্থাৎ ব্যাপকভাবে না হলেও উল্লেখযোগ্যভাবে যে প্রবণতাটি শক্তিশালী হয়ে উঠছে সেটি হল বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির ওপর আধিপত্যের বিষয়ে সামঞ্জস্যের চেষ্টা।

কি ভাবে এই অবস্থা তৈরী হয়েছে ?

বিবেকানন্দের মননালোকে সমাজ-বিশ্লেষণের বিকল্প মডেলে সমাজটা বর্তমানে কি ? এ-প্রসঙ্গ আলোচনায় একটি রেখাচিত্র তুলে ধরার পর যে প্রশ্নটি আসে সেটি হল—কি ভাবে এই অবস্থা তৈরী হয়েছে ? সংক্ষেপে এটি আলোচনা করা যাক্‌ ।

এ-বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকেরা নানান মত উপস্থাপিত করেছেন যার মধ্যে অশোক রুদ্রের তত্ত্বটি সর্বাধুনিক । "বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্র—বৈশিষ্ট্য ও উৎস" প্রবন্ধে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাবেই বাঙালীর জীবনে নানান দ্বন্দ্ব এসেছে। অশোকবাবু যেভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন তা একদেশদর্শী হওয়ায় তাঁর তত্ত্বটিও বিভ্রান্তিকর। তাঁর মতে "বিদ্রোহের কোন ধারণা এই ধর্মের বহির্ভূত, প্রমিথিউজ জাতীয় কোন চরিত্র আমাদের পুরাকাহিনীতে পাওয়া যায় না।" কথাটি ভুল। বেদে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের গুরুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন, ভাগবতে কৃষ্ণ কথা মূলত ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং বাঙালীর লেখা পুরাণে চাঁদসদাগর বিদ্রোহ করেছিলেন মনসা দেবীর বিরুদ্ধে। অশোকবাবু "অস্পৃশ্য বা অন্ত নীচু জাতের লোকদের নিজের অবস্থা জেনে নেওয়াতে কোন সশস্ত্র সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করতে হয়নি" এই মন্তব্য করার আগে যদি রামায়ণ-মহাভারত পড়তেন তবে দেখতে পারতেন যে রাম-রাবণের যুদ্ধে ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিম্নবর্গীয় লোকেরা বীরত্বের সাথেই যুদ্ধ করেছিলেন সশস্ত্র হয়ে, ভাগবত কথায় শ্রীকৃষ্ণ (যিনি ছিলেন গোপজাতির প্রতিনিধি) দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। "বেদের ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু নতুন কোন চিন্তা সম্ভব নয়" মন্তব্য করার আগে তিনি বেদ পড়লে দেখতে পেতেন যে ওতে লেখা আছে "অত্র বেদাঃ অবেদাঃ ভবন্তি" অর্থাৎ সত্যকে জানতে গেলে বেদকে অতিক্রম করে যেতে হবে; তাছাড়া ভারতীয় ষড়দর্শনের (প্রধান ছয়টি দার্শনিক ধারা) মধ্যে চারটিই বেদের উপর নির্ভরশীল নয়। বাঙালীর রক্তপ্রীতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের ফলে নয়, বরং অন্ত্রিক সংস্কৃতির ফসল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেখানে জোরালো সেই উঃপ্রদেশ-বিহার-তামিলনাড়ু ইত্যাদি প্রদেশে পুজার বলি বা তন্ত্রের প্রভাব খুবই কম। "কোশাম্বী"র বক্তব্য তুলে অশোকবাবু লিখেছেন, "শংকরাচার্যের বিরাট কীর্তি—"A is either B is not B"—যুক্তি শাস্ত্রের এই মৌলিক অনুশাসনকে নস্যাৎ করা।" কোশাম্বী ও অশোকবাবুর যুক্তিশাস্ত্র যাই বলুক, বিজ্ঞানের

ক্যালকুলাসে যখন লেখা হয় $\underset{a \leftarrow 0}{Lt}$ তখন কিন্তু a-র মান শূন্যও নয়, "not zero"ও নয়। ফিজিক্সে আলোর তরঙ্গধর্ম ও জড়ধর্মের একত্র উপস্থিতি স্বীকার করা হয়। তাছাড়া কোশাম্বী ও অশোকবাবুর মার্কসবাদে "law of opposites" বলতে কি বোঝানো হয়েছে? অশোকবাবু আরও লিখেছেন, বিবেকানন্দ মিশনারীদের অনুকরণ করে এক নতুন আদর্শ ভারতে প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু ইতিহাস কি বলে? সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাজসেবার আদর্শ ভারতের মাটিতেই উদ্ভূত—বৌদ্ধ শ্রমনেরা শিক্ষা ও চিকিৎসার আলো নিয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে। খৃষ্টান মিশনারীরা এই ভারতীয় আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বলতে গিয়ে অশোকবাবু কেবল ভক্তি পথেরই কথা বলেছেন, অদ্বৈতবাদ যে মানুষকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছে এ-কথা এড়িয়ে গেলেন কেন?

স্বামীজীর বক্তব্য অনুযায়ী বৃটিশ শাসনের প্রভাবে ভারতীয় সমাজমানস এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। তাঁর মতে বৃটিশ বৈশ্যশাসনের প্রবর্তন করেছিল এবং অর্থ ও বিজ্ঞান এই নতুন সভ্যতার ভিত্তি। বৈশ্যশাসক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কেরাণীকুল তৈরী করে বাঙালীর মনে অর্থগৃধ্নুতার বীজ বপন করল, এবং নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ জনমানসে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনাস্থা এনে সত্তাসংকট (identity crisis) উপস্থিত করল। এই আত্মীকরণের সমস্যা—পাশ্চাত্য ভাবধারার কতটুকু গ্রহণ করতে হবে যাতে নিজেদের আইডেন্টিটি বজায় রেখেও নবচেতনার শরিক হওয়া যায়—বাংলার নবজাগরণে বিভিন্ন স্রোত নিয়ে এল। দেশ স্বাধীন হবার পর এই সমস্যার কিছুটা রং বদল ঘটল। বৃহৎ ভারত সংস্কৃতিকে কতটা স্বাঙ্গীকরণ করতে হবে, নতুন মূল্যবোধগুলিকে কিভাবে ও কতটা গ্রহণ করতে হবে, নিজে অ-শ্রমজীবী মানুষ হয়ে শ্রমজীবীদের সমর্থন কতটুকু করবেন এসব প্রশ্নই বাঙালী মধ্যবিত্তদের বর্তমান সংকটের মূলে রয়েছে। এভাবে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তারই পরিণাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরস্পর-বিরোধী ব্যবহার। উচ্চাকাঙ্ক্ষা (careerism) এবং আদর্শবাদের (idealism) মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছেন এরা। এবং যেহেতু গ্রামে ও শহরে এরাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেহেতু জীবন সম্বন্ধে এদের ধ্যানধারণা অন্যান্য গোষ্ঠির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রমিকগোষ্ঠী ক্রমশই Simple economism-এর দিকে ঝুঁকছেন।

এবং গ্রামে কৃষকদের ছেলেরাও বাবু কাজের দিকে আগ্রহী হচ্ছেন। আমরা আগেই দেখেছি বাঙালী সমাজমানসের ভিত্তি জ্ঞান। এই জ্ঞানপ্রীতি না থাকলে সমাজে সংকট দেখা যেতনা, বাঙালীরা তখন পুরোপুরিভাবেই বৈশ্যশক্তিকে অনুসরণ করতে পারত। মারোয়াড়ী সমাজে এ-ধরণের সংকট নেই এ-কারণেই।

কেন এভাবে আছে?

বিষয়টি আলোচনার আগে স্বামীজীর দুটি মন্তব্য মনে করিয়ে দিই। একটি শূদ্রশাসনের প্রাথমিক অবস্থায় বৈশ্যত্ব-ক্ষত্রিয়ত্বের বদলে শূদ্রত্ব থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং দ্বিতীয়ত, সমাজ-পরিচালক অত্যাচারী হলে সমাজ যদি নিবীর্য হয়ে তা নীরবে সহ্য করে তবে রাজা ও প্রজা দুইই হীন থেকে হীনতর অবস্থায় যায়, আর সমাজ বলবান হলে প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এই দুটি মন্তব্যের সাথে স্মর্তব্য আমাদের আগের একটি কথা—আত্মীকরণের সংকট তথা বিভ্রান্তি।

বর্তমানের শাসকদলগুলি ক্ষমতায় এসে বুঝতে পারছেন না এই ক্ষমতাকে কোন্ কাজে লাগাবেন। বিপ্লবের পর রাশিয়াতেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তখন ট্রটস্কি বলেছিলেন বিশ্ববিপ্লব শুরু করতে, আরেকদল বললেন ধনতন্ত্রী বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রের নজরদারীতে পুঁজিপতিদের সুযোগ দাও (নিউ ইকনমিক পলিসি)। আর স্তালিন বললেন একটি দেশেই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কথা। তখন সমস্যা ছিল—চারদিকে পুঁজিবাদী দেশ থাকলে কি রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব? পঃ বঙ্গের বর্তমান শাসকদলের সামনে এই একই সমস্যা একটু ভিন্নরূপে এসেছে। আইনসভাকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করব অথবা অপেক্ষা করব কবে দিল্লীর গদীতে বসতে পারি—এই প্রশ্নের সমাধান হয়নি বলেই রাষ্ট্রশক্তি বিভ্রান্তিকর অবস্থায় রয়েছে। লেনিন "নিউ ইকনমিক্ পলিসি" গ্রহণ করে বৈশ্যশাসনের একটি ইতিবাচক দিকের সাহায্যে রাশিয়াকে প্রাথমিক যুগে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। পঃ বঙ্গের শাসকগোষ্ঠী তাত্ত্বিক কচ্‌কচিতে আটকে থেকে বৈশ্যশাসনের এই দিকটি গ্রহণ করতে পারছেন না।

এবারে সমাজের কথা। আগেই দেখেছি, শৌর্য ও অর্থকে ভিত্তি করে যে গোষ্ঠীগুলি রয়েছে তারা তাদের মূলনীতি (লুটেপুটে খাওয়া) এই রাষ্ট্রব্যবস্থার

চালিয়ে যেতে পারছে বলে রাষ্ট্রশক্তির সাথে এরা আপাতত সংঘর্ষে আসবে না। জ্ঞান ও কায়িক শ্রমকে ভিত্তি করে যে গোষ্ঠীগুলি রয়েছে তাদের এক বড় অংশও উপরোক্ত পন্থায় বিশ্বাসী। যারা দুর্বল তারাও চুপ করে আছে ঝামেলা এড়াবার জন্য। যে অল্পসংখ্যক স্বাধীন গোষ্ঠী আছে তারা যে বারবারই সরকারী হামলার সামনে পড়ছে এ-কথা আগেই আলোচনা করেছি। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে গণ-চেতনার স্তর বর্তমানে দুর্বল, এবং এজন্যই স্বামীজীর কথা-অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন থেকে হীনতর অবস্থায় যাচ্ছে।

বর্তমান বাঙালী সমাজমানসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য—নিজের ব্যর্থতার কারণ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। বাঙালী সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই বাঙালীর বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী করেন উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ঋত্বিকদের, নিজেদের ছেলে-মেয়ে কোন স্কুলে ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে বাঙালী মা-বাবারা ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপরই দোষারোপ করেন, এবং রাজ্যের মন্ত্রীরা নিজেদের ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দেন কেন্দ্রের ওপর। অর্থাৎ পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যা খুঁজে বের করার যে অনীহা সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে সেটিই এই বিভ্রান্তিকে ধরে রাখছে।

বাঙালী জ্ঞান-ভিত্তিক জাতি বলে বুদ্ধিজীবীদের মতো শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারতেন। কিন্তু সরকারের কাছে নানাভাবে টাকা পেয়ে অনেকেই সরকারের তাঁবেদার হয়ে গিয়ে সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বড় ভূমিকা পালন করছেন।

ভবিষ্যতে কি হবে?

এই প্রশ্ন আলোচনায় স্বামীজী দুটি প্রসঙ্গ তুলেছেন। প্রথমত, সামাজিক পরিবর্তনের সূচকগুলি কতখানি কাজ করছে। এটি বোঝার জন্য আমরা গোড়ার দিকে পরিবর্তনের (change) যে মডেলটি দিয়েছি সেটিকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখা দরকার। দ্বিতীয়ত, স্বামীজী কতগুলি শক্তির দিকে লক্ষ্য করতে বলেছেন যে-শক্তিগুলি আপাতত চাপা কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখাচ্ছে। অর্থাৎ নতুন চেতনার প্রকাশ ও নতুন সামাজিক বিন্যাসের দিকে নজর দিতে বলেছেন।

প্রথমে পরিবর্তনের মডেলটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। বর্তমানে

রাষ্ট্রশক্তি যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে উৎসাহী সে-কথা আগেই বলেছি। এই ক্ষমতা সামাজিক যৌথশক্তিগুলিকে নিয়ে যতটা হচ্ছে, জ্ঞানশক্তির ওপর তার চেয়ে কম নয়। বাঙালী সমাজমানস জ্ঞানভিত্তিক। সুতরাং এটি কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা এই সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করবেই। শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যে সরকারী হস্তক্ষেপ এখন যেভাবে বাড়ছে তা আরও বৃদ্ধি পেলে প্রবল সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রশক্তি বিপদের সম্মুখীন হবে। তাছাড়া ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে সরকারের সমর্থক ও দলীয় সদস্যেরা যেভাবে বিশেষ সুবিধা (special privilege) ভোগ করছে এই প্রবণতাও সমাজ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে।

দ্বিতীয়ত, গণচেতনার স্তর সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি আপাতত অবস্থা খুবই করুণ। অবশ্য এরই মাঝে নতুন চেতনা ও বিশ্বাস ক্রমশ দানা বাঁধছে। এ-নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরেই আলোচনা করব।

তৃতীয়ত, অন্তরপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির ওপর আধিপত্যের ব্যাপারে সামঞ্জস্যের অভাব প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করেছি। একদল যেমন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বহুল প্রয়োগে বিলাসিতার দিকে ঝুঁকছে, অন্যদল তেমনি এতে ক্রমশই বীতশ্রদ্ধ হয়ে মূল্যবোধের আবিষ্কারের জন্য ও সত্তার সন্ধানে ধর্মের দিকে ঝুঁকছে। এই দুয়ের টানা-পোড়েন চলছে, এখনই এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের ধারণা করা মুস্কিল।

চতুর্থত, জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জ্ঞানভিত্তিক চেতনা এখনও অর্থগৃধ্নুতার শিকার হয়েছে। যদি এটি পরিবর্তিত হয়ে অর্থের দিকে পুরো ঝুঁকে পড়ে কিংবা আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসে জ্ঞানের পথে আরও এগিয়ে যায় তবে তা সমাজে পরিবর্তন আনবে। অর্থাৎ মারোয়াড়ীদের মতো অর্থভিত্তিক চেতনা কিংবা স্বাধীনতা যুগের মতো আদর্শবাদের দিকে যদি ঝোঁকে তবেই এটি সম্ভব।

পঞ্চমত, অন্য জাতির বা প্রদেশের প্রতি বাঙালীর মনোভাব উঁচু স্তরের নয়। একটি জাতি যখন অন্য একটি জাতির কাছ থেকে শিখতে চায় (যেমন গত শতাব্দীর বাঙালী ইংরেজের কাছে শিখতে চেয়েছিল) কিংবা অন্য জাতিকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে (যেমন রোমের কার্থেজ বিদ্বেষ, জার্মানীর ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইত্যাদি) তখনই ঐ জাতির সমাজে পরিবর্তন সূচিত হয়। ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশবাসীর প্রতি বাঙালীর মনোভাব এই দু-ধরণের নয়,

বরং নিস্পৃহ। বাঙালী যেমন অন্তদের ঘৃণাও করে না, তেমনি কারোর কাছে কিছু শেখার আছে তাও মনে করে না।

আলোচ্য পাঁচটি বিষয় থেকে মনে হয় বাঙালীর সমাজমানসে বা জীবনে অদূর ভবিষ্যতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, এই ধারা আরও বেশ কিছুকাল চলবে। এবারে দেখা যাক নবচেতনা বা নববিন্যাসের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষ রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন, ক্ষমতা-বিন্যাসের পূর্ব ভারসাম্য পালটাচ্ছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও স্বার্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশভাগী হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, একটি ঘটনার পরিণতি বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে। কৃষি পণ্যের দাম বাড়ালে শিল্পে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটছে, আবার শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধির পরিণামে কাপড় ওষুধ ও সারের দাম বাড়ালে তা কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তৃতীয়ত, ছাত্র ও যুবকদের মনে রাজনীতির বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠছে। ফলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যেমন রাজনীতি বিমুখ হয়ে পড়েছে, আরেক দল তেমনি প্রশ্ন তুলছে: বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি? চতুর্থত, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সংকটের উৎস ও চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করে সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশই বেশি করে গ্রহণযোগ্য হচ্ছেন। একদিকে শংকরের "জন-অরণ্য", তপোবিজয় ঘোষের "পথ হাঁটতে মানুষ", সমরেশ মজুমদারের "কালবেলা" ও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসগুলি সমাদর পাচ্ছে, অন্যদিকে মৃনাল সেন, গৌরকিশোর ঘোষও সমাদর পাচ্ছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ সামাজিক সংকট সম্বন্ধে সচেতন হতে চাইছেন। পঞ্চমত, ধর্ম বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে, বিশেষ করে বিভিন্ন সংকটে ধর্মের বক্তব্য কি এটি জানতে চাইছে মানুষ। ষষ্ঠত, অরাজনৈতিকভাবে সমাজসেবার কাজে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় যুবক এগিয়ে আসছে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে যুবকদের সাহায্যে ও স্বাধীন নির্ভীক বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহে বর্তমান বাঙালী সমাজে একটা নাড়া দেওয়া এবং সেই সাথে নবচেতনাসম্পন্ন গ্রামীণ মানুষদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা বেড়েছে। নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতারা যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা (credibility) হারাচ্ছেন, তেমনি মুক্তমতি ধর্মীয় ও সামাজিক নেতারা

জনসমাজে বেশি করে স্বীকৃতি পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এ-ধরণের সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠলে তা আশ্চর্যের বিষয় হবে না।

কি হওয়া উচিত ?

ওপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হবে যে আপাতত এই ধরণের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। স্বামীজী তাঁর রাষ্ট্র চিন্তায় সু শাসনের চেয়ে স্ব শাসনের ওপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতা ও সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের পথ পরিত্যাগ করে গ্রাম-পঞ্চায়েতের যা মূল নীতি তাকে শহরেও প্রসারিত করে সমসমাজ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এই বিপ্লব আন্দোলনের নীতি ও পথ কি হবে এবং ভাবী সমাজের রূপ কি হওয়া উচিত এ-প্রসঙ্গে শুধু স্বামীজীর একটি মতের কথা উল্লেখ করি যাতে তিনি বলেছেন যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারা বেয়ে বিপ্লবের পথ ঠিক করতে হয়।

উপসংহার

স্বামীজীর সমাজচিন্তায় সমাজ এবং সমাজপরিবর্তন, দুইটি দিকই ভিন্ন আধারে স্থান পেয়েছে। সেজন্য দেশ-কালের বিষয়টি গৌণ হয়ে ওঠেনি। মার্কসবাদী তত্ত্বে দেশ-কালকে একটি নির্দিষ্ট ফরমুলার মধ্যে ফেলে সমাজস্থিতি ও সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে নিদান দেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা এবং সমাজ সম্বন্ধে গভীর অন্তদৃষ্টি এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। এই বিচারেই স্বামীজী আজও প্রাসঙ্গিক, ইতিহাস চর্চা ও সমাজ বিশ্লেষনেই নয়, সমাজ পরিবর্তনের দিক নিরূপনেও তাঁর অনন্ত দৃষ্টিভঙ্গী দেশ-কাল বিচারের সহায়ক।

ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সমাজ কোনোটাই স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা তুলে ধরতে অবশ্য স্থান-কাল ছাড়াও মনুষ্যপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক স্থিতির প্রভাব, সমাজ বিকাশের ধারা অনুধাবন করা চাই। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আধারে স্বামীজী এই ধারা বিচার করেছেন, চার গোষ্ঠীযুগের বিকাশে সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করেছেন। এই সূত্রেই তাঁর বিকল্প মডেল একমাত্রিক হয়ে থাকেনি, স্থান-কালের সাথে জাতি বৈশিষ্ট্য ও সমাজ বিকাশ ধারা যুক্ত হয়ে স্বামীজীর সমাজচিন্তাকে অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

নির্ঘণ্ট